
কাউরীবুড়ির মন্দির
অভীক সরকার

কাউরীবুড়ির মন্দির

কাউরীবুড়ির মন্দির

অভীক সরকার

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিমিটেড

KAURI BURIR MANDIR
By : AVIK SARKAR
(A Horror novel)
Code : 63 K 21

Dev sahitya Kutir (Pvt.) Ltd.
21, Jhamapukur Lane, Kolkata-700 009
www.devsahityakutir.com
Tel : 2350-4294/4295/7887
Email : dev_sahitya@rediffmail.com

ISBN. 978-81-945179-8-6

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, জানুয়ারি ২০২১, মাঘ ১৪২৭

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯
থেকে শ্রী রাজর্ষি মজুমদার ও রূপা মজুমদার
কর্তৃক প্রকাশিত এবং বি. সি. মজুমদার
কর্তৃক এ. টি. দেব প্রেস
থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ : সৌজন্য চক্রবর্তী

উৎসর্গ

যিনি প্রথম আমাকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।
আমার বড়মা স্বর্গতা মহামায়া সরকারের স্মৃতিতে।

ভূমিকা

ভূমিকায় একটি কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে প্রথমে আমি উপন্যাস হিসেবে নয়, চেয়েছিলাম একটি বড় গল্প লিখতে।

দুহাজার উনিশের অক্টোবর নাগাদ এক প্রসন্ন প্রভাতে দেব সাহিত্য কুটিরের কর্ণধার রূপাদি আমাকে ফোন করে বললেন পৌষ সংখ্যার জন্য একটি বড় গল্প লিখে দিতে। গরীবের কপালে এসব সৌভাগ্য কালেভদ্রে জোটে। আমিও কৃতজ্ঞথরথর চিত্তে তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে ফেললুম।

কিন্তু ম্যান প্রপোজেস, গড ডিজপোজেস বলে একটা দামি কথা আছে। গল্পটা বেশ জমিয়ে সূত্রপাত করতে গিয়ে দেখি তাতেই শব্দসংখ্যা ছড়িয়ে চৌষট্টি! এরপর যতই এগোই গল্পের ধরতাই মোটামুটি এরিয়াডনের কুখ্যাত সুতোর বলের আকার নিতে থাকে। সে জটিল জাল উদ্ধার করতে শেষমেশ থিসিয়াসকে আসতেই হল। আবির্ভূত হলেন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ।

এখানে বলে রাখা ভালো কাহিনিগঠনের দিক থেকে এই গল্পটি আমার আগমবাগীশ সিরিজের অন্য গল্পগুলির থেকে অনেকটাই আলাদা। কোনো প্রাচীন অভিশাপ বা অতীতে ঘটে যাওয়া কোনো কাহিনি নয়, এই কাহিনির মূল উপজীব্য হল যৌন ঈর্ষা। একজন পুরুষের ওপর কামনার অধিকার নিয়ে দুই মানবীর দ্বন্দ্ব। তার প্রেক্ষাপটে রয়েছে উত্তর আসামের প্রাচীন জনজাতি দেওরিদের একটি শাখা পাতরগোঁয়্যাদের হারিয়ে যাওয়ার ইতিহাস, তাদের শিউরে ওঠা ধর্মীয় আচার। রয়েছে জঙ্গলের মধ্যে জেগে থাকা এক মন্দির, তাকে ঘিরে থাকা অজস্র মিথ।

আর রয়েছে সেই মন্দির ঘিরে থাকা কাউরীদের দল।

এখানে একটি কথা স্পষ্ট করে দেওয়া দরকার যে পাতরগোঁয়্যাদের ইতিহাস সংক্রান্ত অংশটি সম্পূর্ণরূপে আমার কল্পনাপ্রসূত, বাস্তবের সঙ্গে এর দূর দূর অবধি কোনো মিল নেই। একই কথা বলা যায় তাদের ধর্মবিশ্বাস সংক্রান্ত ঘটনাবলী নিয়ে। পাতরগোঁয়্যারা সত্যিই দেওরিদের একটি হারিয়ে যাওয়া উপজাতি, এই তথ্যটুকু ছাড়া বাকি সমস্ত তথ্যাবলী আমার স্বকপোলকল্পিত, তাকে সঠিক বলে মেনে নিলে তা সত্যের অপলাপ হবে।

কাহিনিটি শেষ পর্যন্ত একটি পঁয়ত্রিশ হাজার শব্দের উপন্যাস হয়ে দাঁড়ায়, এবং আমার সমস্ত আশঙ্কা অমূলক প্রমাণ করে উপন্যাসটি রূপাদির পছন্দও হয়। যেদিন রূপাদি ফোন করে জানালেন যে তাঁরা এটি বই আকারে প্রকাশ করতে চলেছেন, স্বীকার করতে বাধা নেই সেদিন সত্যিই গায়ে কাঁটা দিয়েছিলো। জ্ঞান হওয়া ইস্তক যে প্রকাশনীর বই পড়ে আমার বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পড়ার অভ্যেস তৈরি হয়েছে, সেই ঐতিহ্যশালী দেব সাহিত্য কুটির থেকে আমার লেখা বই প্রকাশিত হবে সে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। পূর্বপুরুষদের অসীম সুকৃতি ছাড়া এ সৌভাগ্য সম্ভব নয়।

আপাতত আমার প্রাককথনের নটে গাছটির মুড়োলো। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি কোনো লেখা যে মুহূর্তে বই হিসেবে পাঠকের হাতে পৌঁছোয়, সেই মুহূর্ত থেকে তার মালিকানা পাঠকের। তিনি পড়েন বলেই লেখক লেখেন, নইলে মিথ্যে হতো সন্ধ্যাতারা ওঠা, মিথ্যে হতো কাননে ফুল ফোটা। আশা করি আমার আগের বইগুলির মতো এই উপন্যাসটিকেও পাঠককূল সাদরে গ্রহণ করবেন। আপনাদের পাঠপ্রতিক্রিয়ার আশায় রইলাম। আপাতত এখানেই বিরতি দিচ্ছি। অলমতি বিস্তারেণ, নমস্কার।

অভীক সরকার

১৬ ডিসেম্বর ২০২০

কাউরীবুড়ির মন্দির

নিবিড় ও গহিন অরণ্যের মধ্যে এক গাঢ় নিস্তব্ধ রাত। চারিদিক ছেয়ে আছে আদিম বনজ নৈঃশব্দ্যে। কোথাও কোনো শব্দ নেই, প্রাণের কোনো সাড়া নেই, সময় এখানে মৃত, জীবন এখানে স্তব্ধ।

অরণ্যের মধ্যে একটি অতি প্রাচীন মন্দির। তার আদিম পাথুরে গায়ে খোদাই করা আছে শতাব্দীপ্রাচীন অজানা ইতিহাসের প্রলেপ। সেই পাথরের গায়ে এই প্রাগৈতিহাসিক আদিম বনভূমির ছায়া এসে পড়ে, এসে পড়ে চাঁদের অপার্থিব জ্যোৎস্না। তারা ফিসফিস করে বলে যায় কত অজানা গল্প, কত গোপন দীর্ঘশ্বাসের কাহিনি।

সেই মন্দিরের দেওয়ালে উৎকীর্ণ রয়েছে একটি অদ্ভুত মূর্তি, আমাদের চেনা মূর্তির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মূর্তির সামনে জ্বলছে দুটি বড় বড় প্রদীপ। প্রদীপ দুটির মধ্যস্থলে বজ্রাসনে বসে আছেন একজন নারী। নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো অচঞ্চল তিনি। তাঁর শুষ্ক শানিত মুখে ক্লান্ত আনন্দশৈথিল্য। অনেক দুঃসাধ্য উপাসনার শেষে আজ তিনি জয়ী, আজ তিনি সিদ্ধ।

''মাই...তুই এসেছিস মাই?'' নিজের মাতৃভাষায় ধীর ও শান্ত স্বরে প্রশ্ন করলেন তিনি, জনহীন অরণ্যের বাতাসে ছোট ছোট ঢেউ খেলে গেল অক্ষরমালাগুলি।

কিছুক্ষণের স্থির স্তব্ধতার পর অন্ধকার রাত্রির বুক চিরে, পাতালের গহিন থেকে, অজানা নক্ষত্রলোক থেকে উঠে এল এক অলৌকিক অপার্থিব খনখনে স্বর—

''আমাকে কে জাগালি রে মেয়ে? কে তুই?''

''আমি তোর দেওরি রে মাই। তোর মেয়ে।''

''কী চাস মেয়ে? কেন জাগালি আমাকে?''

''আশীর্বাদ চাই মাই, নাগযক্ষিণীর আশীর্বাদ।''

''কেন রে মেয়ে? এমন ভয়ানক দৈবী শক্তি নিয়ে কী করবি তুই?''

''আমার সবকিছু যে হারিয়ে যাচ্ছে মাই...ওই...ওই ডাইনি যে ছিনিয়ে নিতে এসেছে আমার সবকিছু। আমি তা হতে দেব না মাই, আমার সবকিছু হারিয়ে আমি পথের ভিখিরি হতে পারব না।''

''শোন রে মেয়ে, নাগযক্ষিণীর জাদু বড় কঠিন জাদু, বড় দুরূহ বিদ্যা। শুধুমাত্র মন্ত্রসাধনায় তাকে আয়ত্ত করা যায় না। হৃদয় শুদ্ধ না হলে, চিত্ত পবিত্র না হলে, বুদ্ধি প্রসন্ন না হলে তাকে অধিকার করা বড় কঠিন। বিন্দুমাত্র বিচ্যুতিতে সে বিদ্যা মুহূর্তে মহাবিষধর নাগ হয়ে দাঁড়ায়, প্রতিশোধস্পৃহায় নিজের প্রয়োগকারীকেই দংশন করে বসে...''

''জানি রে মাই...'' নারীটির স্বর অটল, অচঞ্চল, ''তোর মেয়েরা এ সবই জানে। এইসব জেনেই আজ আমি জাগিয়েছি তোকে।''

''আরেকবার ভেবে নে মেয়ে, যা চাইছিস তার কিন্তু মূল্য বড় সাংঘাতিক।''

''বল রে মাই, কী চাস তুই।''

''দেওয়ার মতো কী মূল্য তোর কাছে আছে রে মেয়ে?''

''ধন, সম্পদ, যৌবন, জীবন, সব আছে রে মাই। বল মাই, একবার মুখ ফুটে বল, কী বলি চাস তুই।''

সময়ের গহ্বর থেকে, মৃত নক্ষত্রের আলো বেয়ে সেই গহিন অরণ্যের বাতাসে ভেসে এল কার অশরীরী উত্তর—

''ভালোবাসা।''

* * * *

ঝামেলাটা শুরু করেছিল বিশু-ই, মানে হরেন সাঁপুই-এর বড় ছেলে বিশ্বনাথ। কিন্তু সেই মওকায় মঙ্গলবারের সন্ধ্যায় যে অমন একটা হাতে গরম গল্প জুটে যাবে...

সেটা ছিল এক বর্ষার সন্ধে। সারাদিন ধরে কখনও মুষলধারে, কখনও টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়েই চলেছে। একে পনেরোই অগস্ট হওয়ার দরুন আফিস-কাছারি সব বন্ধ, তার ওপর ট্রেনের লাইনে জল জমে ট্রেনও চলছে না। পথঘাট জলে ডুবে একশা, এমনকি এ এলাকার অমন জমজমাট সাহাগঞ্জের বাজারেরও ঝাঁপ বন্ধ বলে খবর। চারিদিকে জলে থইথই, কবির ভাষায় চারিদিকে জল শুধু জল। দেখে দেখে চিত্ত মোর হয়েছে বিকল।

মোটমাট এই ঘরবন্দি অবস্থায় তিতিবিরক্ত হতে হতে শেষমেশ পাড়ার কয়েকজন ক্লাবঘরে এসে জমায়েত হয়েছে। আড্ডার অনুপান বলতে অবশ্য হরির দোকানের চা আর মুড়ির সঙ্গে গরমাগরম চপ-ফুলুরি। তাই নিয়ে গুলতানি চলছে সবার মধ্যে।

ক্লাবঘরের এককোণে বসে ন'পাড়ার ভজা আর রঘু খুব মন দিয়ে ক্যারম পিটোচ্ছিল। বাকিদের আবার ক্যারমে তেমন মন নেই, তারা কয়েকজন মিলে ব্রিজ খেলছিল। বাকিরা বলতে বিশু, বংশী, শিবু আর গদাই। মধ্যমণি হয়ে অবশ্য বসেছিলেন একজনই, ভবতারণ চট্টোপাধ্যায়, ওরফে চাটুজ্জেমশাই।

চাটুজ্জেমশাই আমাদের পাড়ায় এসেছেন বেশিদিন নয়। চাকরি করতেন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে। ছেলেমেয়ে নেই, স্ত্রী গত হয়েছেন বছর দুয়েক হল। তারপরেই ভিআরএস নিয়ে নেন ভদ্রলোক। সেই টাকায় মাস ছয়েক আগে তিনি এ পাড়ার মুখুজ্জেদের একতলা পোড়ো বাড়িটা সস্তায় কিনে ফেলেন। সেটাকে সংস্কার করে বসবাস করছেন তাও নয় নয় করে তিন-চার মাস হয়ে গেল।

ভদ্রলোককে দেখলে প্রথম দর্শনে কাশীর ডাঁসা পেয়ারার কথা মনে পড়ে। ছোটখাটো রোগাসোগা চেহারা, গায়ের রং টকটকে ফর্সা, আর মাথাজোড়া চকচকে টাক। মুখে সবসময়ই একটা শান্ত সৌম্য হাসি লেগেই আছে। ভদ্রলোকের বহু গুণের মধ্যে একটা হল আয়ুর্বেদ। তা ছাড়া জ্যোতিষচর্চার ওপর দখলও অসামান্য। নিরহংকারী সদাশয় মানুষ, কারও সাতেপাঁচে নেই। নেশা বলতে শুধু গোল্ড ফ্লেক সিগারেট, দুধ-চিনি ছাড়া কড়া চা আর বই।

তবে ভদ্রলোকের সবচেয়ে বড় যে গুণটির জন্য তাঁকে ছাড়া এদের আড্ডাটা জমে না, সেটা হচ্ছে গল্পের অফুরন্ত ভাঁড়ার। আর সেসব গল্পই রীতিমতো যাকে বলে শিরশিরানি জাগানো ভয়াল ভয়ংকর অলৌকিক গল্প।

কথা হচ্ছিল অবৈধ প্রেম নিয়ে। ব্রিজ খেলতে খেলতেই বিশু আর বংশীর মধ্যে একটা ঝামেলা পাকিয়ে উঠছিল ক্রমেই। বিশুর মতে ভালোবাসা ইজ ভালোবাসা, তার আবার বৈধ-অবৈধ কী? ওদিকে বংশীর বক্তব্য, সবাই যদি তাই-ই ভাবে তাহলে তো সমাজ-টমাজ এসব রাখার কোনো মানেই হয় না, অসভ্য জংলিদের মতো বনে-জঙ্গলে গিয়ে থাকলেই হয়! বিশু পালটা দিল, মানবমন অনেক জটিল জিনিস, তাকে নিয়মকানুনের নিগড়ে বেঁধে রাখা অসম্ভব ইত্যাদি।

বিশুর কথাবার্তা ক্রমেই ক্ষুরধার হয়ে উঠছিল। হাজার হোক পড়াশোনা করা বলিয়ে কইয়ে ছেলে। ওর সঙ্গে যুক্তিতর্কে বংশী পারবে কেন? শেষমেশ গদাই একটা বিলো দ্য বেল্ট হিট করতে বাধ্য হল, ''হ্যাঁ রে বিশু, তোর লেটেস্ট চিড়িয়ার খবর কী? সে আছে না গেছে?''

একটু রাগত চোখে এদিকে তাকাল বিশু, তারপর বলল, ''কেন, জেনে কী করবি?''

''আহা বলই না'', ফুট কাটল শিবু।

''নেই।'' সংক্ষিপ্ত উত্তর।

হুল ফুটোল বংশী, ''তা তিনি এবার কার সঙ্গে গেলেন রে বিশু? তোর বন্ধু, নাকি তার বান্ধবীর হাজব্যান্ড?''

উঠে বসল বিশু, তারপর ক্রুদ্ধস্বরে বলল, ''তাতে তোদের কী বে?''

''তুই তো আবার হাত দেখতে এক্সপার্ট শুনেছি। তা বাপু, মেয়েদের হাত-টাত ধরার আগে একটু বিচ্ছেদ, বিরহ এসব রেখা-টেখাগুলো দেখে নিলে পারিস তো।'' এবার গদাই।

এখানে বলে রাখা ভালো, বিশু হাত দেখতে জানে। সেজন্য মেয়েমহলে ওর একটা বাড়তি খাতিরও আছে। লোকে অবশ্য বলে ওর হস্তরেখা শিক্ষা নাকি ওই উদ্দেশ্যেই। তবে ছোকরা আপাতত চাটুজ্জেমশাইয়ের আশেপাশে ঘুরঘুর করছে আরও কিছু শেখার ধান্দায়।

বিশু গোঁজ হয়ে বসে রইল। বোঝা গেল যে ছোকরা বিলক্ষণ চটেছে। তাই শান্তির জল ছেটাবার প্রচেষ্টায় এবার নামতে হল সর্বজনপ্রিয় রঘুকে, ঠান্ডা মাথার ছেলে বলে বাজারে যার বেশ সুনাম আছে। স্ট্রাইকার দিয়ে একটা ঘুঁটি তাক করতে করতেই বলল, ''আহা বলই না বাবা। আমাদের কি আর তোর মতো কপাল? নাকি তোর মতো ক্যালি আছে? আমাদের ওই শুনেই একটু শান্তি।''

একটু ঠান্ডা হল ছোঁড়া, খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ''অন্য কারও সঙ্গে নয়। নিজের বরের সঙ্গেই চলে গেছে!''

শুনে সবাই তো যাকে বলে স্তম্ভিত! প্রথমে আর্তনাদ করে উঠল শিবুই, ''নিজের বরের সঙ্গে চলে গেছে মানে? এবার তুই একজন বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে প্রেম করছিলিস?''

ছোকরা একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে হ্যাঁ-সূচক ঘাড় নাড়ল। বাকিরা তো বিস্ময়ে একেবারে থ!

ইত্যবসরে খুক খুক করে কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন চাটুজ্জেমশাই। তারপর বললেন, ''আমাদের বিশুবাবু এবার বেশ জটিল প্রেমজালে জড়িয়েছিলেন মনে হচ্ছে? তা ভালো, চলতি কথায় বলে যার সঙ্গে মজে মন, কী বা হাড়ি কী বা ডোম!

তবে একটা কথা বলি বাবা। নিষিদ্ধ প্রেম হল নিষিদ্ধ নেশার মতো, বুঝলে তো। নেশা করার থেকে নেশা লুকোবার ব্যাপারটাতেই লোকে মজে বেশি। তাতে অবশ্য ঝুঁকি কম নয়। ধরা পড়লে হেনস্থা, পাড়ায় ছিছিক্কার, আত্মীয়-প্রতিবেশীদের কাছে মাথা নীচু হওয়া তো আছেই। সেরকম হলে প্রাণের ঝুঁকিও বড় কম থাকে না। প্রায়শই খবরের কাগজে এই নিয়ে খুনখারাপির খবর লেগেই থাকে, দেখেছ নিশ্চয়ই। যৌন ঈর্ষা বড় আদিম মনোবৃত্তি, মুহূর্তেই তা মানুষকে অন্ধ দানব বানিয়ে দিতে পারে। এই ফাঁদে একবার যে পা দিয়েছে তার সঙ্গে উন্মত্ত খ্যাপা ষাঁড়ের কোনো তফাত নেই হে, তখন সে যা খুশি তাই করতে পারে।''

ধরতাইটা ধরে নিল গদাই, ''এই নিয়ে আপনার ঝুলিতে কোনো অভিজ্ঞতা আছে নাকি দাদা? থাকলে ঝেড়ে ফেলুন না। বর্ষার রাতে এসব চাদরচাপা গল্প জমবে ভালো।''

চাটুজ্জেমশাই জানালার বাইরের দিকে চেয়েছিলেন। হ্যারিকেনের আলোয় তাঁর লম্বা ছায়া দেওয়ালের ওপর জোলো বাতাসে অল্প অল্প কাঁপছিল। সেদিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে একটা গোল্ড ফ্লেক ধরালেন তিনি। তারপর দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভিয়ে জঙ্গলে আমার সঙ্গে যা যা হয়েছিল, সেসব মনে পড়লে এখনও ভয়ে কেঁপে উঠি। মানুষ যৌন ঈর্ষায় একবার হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে গেলে কী যে করতে পারে তার ইয়ত্তা নেই!''

বলা বাহুল্য বাকিরা আরও ঘন হয়ে এল চাটুজ্জেমশাইয়ের কাছে। এই বৃষ্টির সন্ধেবেলায় এরকম একটা জমাটি গল্পের থেকে ভালো আর কী হতে পারে? চাটুজ্জেমশাইও গোল্ড ফ্লেকে একটা লম্বা টান দিয়ে শুরু করলেন।

''তখন আমি অফিস থেকে ছুটি নিয়ে উত্তর আসামের বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি...'' হরির চায়ে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে শুরু করলেন চাটুজ্জেমশাই, ''সদানন্দকাকু জানেন যে আমি ছুটি কাটাতে এসেছি। কিন্তু আমার লক্ষ্য একটাই, গোলকপুষ্প।''

''কী বললেন? কীসের পুষ্প?'' কথাটা শুধু রঘু নয়, আরও অনেকেই শুনতে পায়নি মনে হল।

''গোলকপুষ্প। ইয়ারসাগুম্বার একটা ভ্যারিয়েন্ট।''

''কীসের ভ্যারিয়েন্ট খুঁজছেন বললেন? কীসের গুম্ফা?'' বিস্মিতস্বরে প্রশ্ন করল গদাই। আমরাও হতভম্ব!

''গুম্ফা নয়, গুম্বা। ইয়ারসাগুম্বা।'' কঠোর চোখে গদাইয়ের দিকে তাকালেন চাটুজ্জেমশাই, ''এই ইয়ারসাগুম্বা বা ক্যাটারপিলার ফাঙ্গাস হচ্ছে প্রকৃতির এক আশ্চর্য আবিষ্কার, পৃথিবীর সবচেয়ে দামি ঔষধিও বটে। শ্বাসকষ্ট থেকে শুরু করে কিডনি আর লিভারের বিভিন্ন রোগ সারাতে এর জুড়ি নেই। তবে যে বিশেষ গুণটির জন্য পৃথিবীজোড়া আয়ুর্বেদিক মেডিসিনের বাজারে এর বিপুল খ্যাতি'', গলাটা একটু নীচু করলেন চাটুজ্জেমশাই, ''সেটা হচ্ছে যৌন সক্ষমতা। পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে মানুষের যৌন তাড়না এবং যৌন সক্ষমতা বাড়াতে এই ভেষজ অ্যাফ্রোডিজিয়াকটির জুড়ি নেই। এর ইংরেজি নামই হচ্ছে হিমালয়ান ভায়াগ্রা।''

''কোথায় পাওয়া যায় এ জিনিস?'' প্রশ্ন করল ভজা।

''এ কি আর বাজারে পাওয়ার জিনিস হে? অতি দুষ্প্রাপ্য, অতি দুর্মূল্য বস্তু। পাওয়া যায় একমাত্র তিব্বতের দিকেই, সি-লেভেল থেকে সাড়ে তিন হাজার ফিট উচ্চতার ওপরে। একটু নেমে এলে অবশ্য নেপালেও পাওয়া যায়। স্থানীয়রা বলে কীড়াজড়ি।''

''জিনিসটা দেখতে কীরকম?'' গল্পের গন্ধে গন্ধে ক্যারম পেটানো থামিয়ে রঘুও এগিয়ে এসেছে এদিকে।

''জিনিসটা দেখতে অবশ্য একটু অদ্ভুত, বুঝলে। দৈর্ঘ্যে আর আকারে বেশি বড় না, ধরো এই দেশলাই কাঠির সাইজের হবে।''

''তা মহার্ঘ বললেন কেন?'' কৌতূহলী হল বংশী। ওর ওষুধ ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যবসা।

''মহার্ঘ কেন?'' অল্প হাসলেন চাটুজ্জেমশাই, ''ও বস্তুটির এক কিলোর দাম, তা ধরো এখনকার বাজারে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি মতো হবে।''

''ষাট থেকে পঁয়ষট্টি বলতে?''

''লাখ।''

''লাখ? ষাট-পঁয়ষট্টি লাখ?'' শুনে আমরা তো হাঁ! ''মানে এক গ্রামের দাম ছয় থেকে সাত হাজার টাকা? এ-এ-এ তো...'' বলতে গিয়ে তুতলে যায় শিবু।

''সোনার থেকেও দামি'', মৃদু হাসলেন চাটুজ্জেমশাই।

''তা এই কীড়াজড়ি ওরফে ইয়ারাসাগুম্বার ব্যাপারে আমরা আয়ুর্বেদিক লাইনের লোকজনেরা সবাই মোটামুটিরকম জানি। আমি যে সময়ের কথা বলছি সে ধরো তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা। তখনও এইসব ভায়াগ্রা-টায়াগ্রা আবিষ্কার হয়নি।

আমি তখন নর্থ বেঙ্গলে পোস্টেড। চাকরিবাকরি করি, খাইদাই আর অবসর সময়ে বিভিন্ন অজানা পাহাড়ি ভেষজের খোঁজ করি। সেই করতে গিয়ে ওখানকার কিছু এজেন্টের সঙ্গে আমার বেশ সখ্য হয়ে গেছিল। তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু ছুটকোছাটকা খবর পেতাম ঠিকই, তবে তাতে মন ভরত না।

সেইভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল। কেটে যেতও, যদি না উনিশশো নব্বই সালের আশ্বিন মাসের এক সন্ধেয় দৈবাৎ আমার হাতে একটা প্রাচীন পুথি এসে পড়ত।

পুথিটা নিয়ে এসেছিল ওসমান, আমার শিলিগুড়ির চেনা এজেন্ট। নর্থ বেঙ্গল আর নর্থ-ইস্ট জুড়ে পুরোনো পুথিপত্র জোগাড় করার লাইনে ও ছিল বেতাজ বাদশা। আমাকে ওসমান একটা আলাদা খাতির করত। কারণ সেরকম সেরকম ভালো পুথি পেলে আমি উচিত দাম দিতে কোনোদিনই কসুর করিনি।

পুথিটা একটা পুরোনো আয়ুর্বেদশাস্ত্রের পুথি। রচয়িতা 'কামরূপ-দেশাগত' জনৈক ব্রাহ্মণ, নাম রুচিনাথ বড়গোঁহাই। পুথিটার বয়েস কিন্তু খুব বেশি না, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ বা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক নাগাদ লেখা, কারণ তাতে 'বৃটিস সৈন্যপুঞ্জ' এবং 'লংডং যবননগরী'-র উল্লেখ আছে। অর্থাৎ লেখক ইংরেজ রাজত্বের ব্যাপারে সম্যক ওয়াকি-বহাল। সময়কালটা বুঝতে অবশ্য আরও সুবিধা হল, কারণ ভদ্রলোক তাঁর

রাজ্যের রাজা হিসেবে উল্লেখ করেছেন ‘স্বর্গদেউ চন্দ্রকান্ত সিংহ’-র কথা। এই অহোমরাজের রাজত্বকাল আঠেরোশো এগারো থেকে আঠেরোশো আঠেরোর মধ্যে।

পুথিটায় প্রথম দিকে তেমন কিছু ইন্টারেস্টিং পাইনি। সাধারণ আয়ুর্বেদিক গাছগাছালির বিবরণ, তার প্রায় সবই আমার চেনা, নতুন কিছু নেই। পাতা ওলটাতে ওলটাতে ভাবছিলাম ওটা ওসমানকে ফিরিয়েই দেব কি না।

থমকে গেলাম মাঝামাঝি এসে। কয়েকটা পাতা পড়ে নিজের চোখদুটোকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আরিব্বাস, এ তো পুরো স্বর্ণখনি!

ওসমান খুব সম্ভবত আমার চোখমুখ দেখে কিছু একটা আন্দাজ করেছিল নিশ্চয়ই, নইলে হঠাৎ করে অমন একটা সাধারণ পুথির দাম হাজার টাকা হেঁকে বসবে কেন? তখনকার দিনে হাজার টাকার দাম অনেক। তবুও বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে টাকাটা ওসমানের হাতে তুলে দিলাম।’’

‘‘কেন? তাতে কী ছিল চাটুজ্জেমশাই?’’ প্রশ্নটা বংশীই করল বটে। তবে আমাদের সবার মনেও তখন ওই একই জিজ্ঞাসা।

সামনে রাখা চায়ের ভাঁড়ে একটা চুমুক দিয়ে ফের শুরু করলেন চাটুজ্জেমশাই, ‘‘যা ছিল আমার কাছে তখনই তার দাম লাখ টাকার সমান। সেটি হচ্ছে গোলকপুষ্প নামে একটি অতি দুষ্প্রাপ্য ভেষজলতার উল্লেখ।

এই গোলকপুষ্পের উল্লেখ এর আগেও এক-দু’ জায়গায় পেয়েছি, তবে তা সবই ভাসা ভাসা। শুধু জানতে পেরেছিলাম যে গোলকপুষ্প পাওয়া যায় উত্তর আসামের জঙ্গলে। ডিব্রুগড় থেকে শুরু করে ধুবড়ির মাঝামাঝি কোনো এক জঙ্গলের মধ্যে। তার নাকি অনেক গুণাগুণ, বিশেষ করে এর রস নাকি যাবতীয় যৌন রোগের অব্যর্থ দাওয়াই।

ওসমান চলে যেতেই চট করে রাতের খাওয়াটা সেরে পুথিটা নিয়ে চৌকিতে লম্বা হলাম।

আগাগোড়া সংস্কৃতে লেখা পুথি, বেশি বড় নয়। পুরোটা পড়ে ফেলতে সময় লাগল ঘণ্টা দুয়েকের সামান্য বেশি।

পড়তে পড়তে ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠছিলাম। পুথিতে এই ভেষজের গুণাবলির ব্যাপারে যা যা পড়লাম সেসব যেমনই আশ্চর্যের তেমনই অদ্ভুত। এমনকি এর এমন কিছু কিছু প্রয়োগের কথা আছে যেগুলো বিশ্বাস করা একটু কঠিন, মানে আয়ুর্বেদের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই। প্রধান যে গুণ, সেটা তো ইয়ারসাগুম্বার সঙ্গে একেবারে হুবহু মিলে যায়ই। এ ছাড়াও এর দ্বারা বেশ কিছু জটিল স্নায়ুরোগের চিকিৎসা, বিভিন্ন মেয়েলি অসুখের প্রতিবিধানও নাকি সম্ভব।

শুধু শেষের শ্লোকটার অর্থ তখন বুঝতে পারিনি। যখন বুঝতে পারলাম, তখন ব্যাপারটা হাতের বাইরে চলে গেছে।’’

‘‘কী সেটা?’’ প্রশ্নটা কে করল ঠিক বোঝা গেল না।

একটু থামলেন চাটুজ্জেমশাই, তারপর একটা সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালেন, ‘‘‘গোলকপুষ্পাৎ মহাভয়ং সঞ্জাতং যদ্ভবিষ্যতে। তদ্ভয়ং নিবারণার্থং গোলকপুষ্পং বিধীয়তে।’ অর্থাৎ গোলকপুষ্প থেকে যদি মহাভয় উৎপন্ন হয়, তাহলে গোলকপুষ্পেরই সাহায্য লইবে।

তবে যেটা দেখে আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম, সেটা হচ্ছে যে এই ভেষজটির প্রাপ্তিস্থান একেবারে নির্দিষ্ট করে লিখে দেওয়া হয়েছে। আর সেই শ্লোকটা এতবার পড়েছি যে মুখস্থ হয়ে গেছিল। বেংমোরা গ্রামস্য উত্তরম্ মাগুরি ইতি নামঃ সরঃ। তত্র দেবীস্থানে জাতি ইয়ম্ গুল্মম্ বিচিত্রম্ চ। অর্থাৎ কিনা, বেংমোরা গাঁওয়ের উত্তরে যে মাগুরি বিল, তার কাছে আছে দেবীস্থান। সেই মন্দিরের গর্ভগৃহেই ফোটে এই আশ্চর্য গুল্মল□□□□।

বেংমোরা যে উত্তর আসামের প্রধানতম শহর তিনসুকিয়ার আদি নাম, সে আমি জানতামই। ম্যাপ দেখে-টেখে মাগুরি বিলও খুঁজে পাওয়া গেল। বলা বাহুল্য এরপর যদি এর খোঁজে তিনসুকিয়ার জঙ্গলে না যাই, তবে আমার আয়ুর্বেদশাস্ত্রে এতদিনের আগ্রহ সবই বৃথা। টাকার কথাটাও ভুললে চলবে না। একবার যদি খুঁজেপেতে এই জিনিস আমার হাতে আসে, আর তারপর যদি এর সাপ্লাইয়ের ব্যবসাটা দাঁড় করাতে পারি, তাহলে আমার অন্নবস্ত্রের সংস্থানের কথা ছেড়েই দিলাম, আমার পরের কয়েকপুরুষ পায়ের ওপর পা তুলে হেসে খেলে চালিয়ে দিতে পারবে। তার ওপর খ্যাতির লোভটাও কম নয়, চাই কি হয়তো ভেষজটার বৈজ্ঞানিক নামকরণই হয়ে গেল অফিওকর্ডিসেপ্স ভবতারণেসিয়া!

উঠেছিলাম লখিমপুর ডিস্ট্রিক্টে সদানন্দ চৌধুরীর বাড়িতে, টাউনের নাম তিনসুকিয়া। এখন তো তিনসুকিয়া বড় শহর, উজনি বা আপার আসামের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। তখন তিনসুকিয়া বড়সড় গঞ্জ ছিল বললেই চলে।

সদানন্দকাকু ছিলেন আমার বাবার গ্রামতুতো ভাই। খুব দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে আসা লোক। কাকুর বিধবা মা আমাদের গ্রামের বাড়িতে ঘর মোছার কাজ করতেন। কাকুর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে ঠাকুর্দা ওঁর পড়াশোনার ভার নেন ও তাঁরই চেষ্টায় সদানন্দকাকু গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেন। তারপর বিভিন্ন কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিতে দিতে আসাম সরকারের অধীনে একটি সরকারি চাকরি জোটান। তখন থেকেই অবশ্য আমাদের সঙ্গে কাকুর যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে আসে। শুধু মাঝে মাঝে খবর পেতাম যে কাকু নিজ অধ্যবসায়ে চাকরির জায়গায় প্রভূত উন্নতি করেছেন।

যদিও অনেকদিন ধরেই আমাদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল না, তবুও একটা চিঠি ছেড়ে দিয়েছিলাম ওঁর ডিপার্টমেন্টের ঠিকানায়। তবে তার ফলাফল যে অমন হবে সে অবশ্য আমি ভাবিনি।

ট্রেন থেকে নেমে দেখি সদানন্দকাকু স্বয়ং এসে উপস্থিত। আমি ওঁকে অবশ্য দেখেই চিনেছি, সামান্য মোটা হওয়া আর চুলে পাক ধরা ছাড়া আর কোনো বদল নেই। তবে আমাকে যে উনি কী করে চিনলেন সেটা একটা প্রশ্ন বটে। কারণ উনি আমাকে শেষ দেখেছেন আমার বয়েস যখন আট। আর আমি যখনকার কথা বলছি তখন আমার বয়েস আঠাশ, প্রায় কুড়ি বছরের ব্যবধান। তবে সে রহস্য কেটে গেল যখন উনি বললেন যে 'তোমাকে দেখলেই চণ্ডীদার ছেলে বলে চেনা যায় বাবা, একেবারে সেই মুখ কেটে বসানো।' আমার বাবার নাম ছিল চণ্ডীচরণ।

তিনসুকিয়াতে আমাদের অফিসের ইনস্পেকশন বাংলোতে আমার বুকিং করা ছিল। কিন্তু কাকু আমার কোনো কথাই শুনলেন না, স্টেশন থেকে একপ্রকার জোর করেই আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে তুললেন তাঁদের বাড়িতে। বাড়ি বললে অবশ্য কমই বলা হয়, সে এক বিশাল প্রশস্ত বাংলো। বোঝা যায় যে কাকু এই ক'বছরের মধ্যে কম উন্নতি করেননি! তবে অত বড় বাংলোয় থাকার মধ্যে ওই তিনজনই। সদানন্দকাকু, তাঁর স্ত্রী অন্নপূর্ণা কাকিমা আর তাঁদের মেয়ে মাধুরী।

আর আমার গল্প এই মাধুরীকে নিয়েই। গোলকপুষ্প নিয়ে তো বটেই!

আসার পর থেকেই কাকিমা আর মাধুরীর সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গেল। কাকিমার বোধহয় ছেলের শখ ছিল, আমাকে পেয়ে সেই অতৃপ্ত মাতৃস্নেহ প্রায় দুর্নিবার হয়ে উঠল। কাকুও নিশ্চয়ই ওঁকে সবিস্তারে আমার ঠাকুর্দা আর বাবার সাহায্য করার কথা বলেছিলেন। ফলে দুর্বার মাতৃস্নেহ আর কৃতজ্ঞতা মিশিয়ে যে জিনিস দাঁড়াল সে আর কহতব্য নয় ভাই, ভালোবাসার অত্যাচার বললেই চলে। তার ওপর কাকিমার রান্নার হাতটি ছিল সোনায় মোড়া। তোমরা তো জানোই, ব্রহ্মপুত্রের মাছের স্বাদই আলাদা। আহা, প্রায় তিরিশ বছর হয়ে গেল, সেই রান্না এখনও মুখে লেগে আছে ভাই।

মাধুরীকে দেখে প্রথম থেকেই মনে হয়েছিল ভারী ভালো এবং ঠান্ডা মেয়ে। ততদিনে আমি জ্যোতিষচর্চায় মোটামুটি নাম করে ফেলেছি। মাধুরীকে দেখেই বুঝলাম যে মেয়ে তুলারাশির জাতক, যেমন ঠান্ডা শান্ত

স্বভাব, তেমনই বুদ্ধিমতী। খুব সম্ভবত বৃহস্পতির স্থান উচ্চ, সামগ্রিক আচার-আচরণের মধ্যে একটা ধীর এবং প্রাজ্ঞ ব্যাপার আছে। সব মিলিয়ে যাকে বলে বেশ প্লেজেন্ট পার্সোনালিটি।

তবে প্রথম দিন থেকেই একটা ব্যাপার কিন্তু আমার নজর এড়ায়নি। মেয়েটাকে দেখে মনে হত সবসময়ই যেন একটা আলগা বিষাদের চাদর গায়ে জড়িয়ে রেখেছে। ম্রিয়মাণ মুখ, মরা চাউনি। যেন বুকের মধ্যে কোথাও একটা চাপা কষ্ট লুকিয়ে রেখেছে।

এদিকে আমার কাজ এগোচ্ছিল খারাপ না। সদানন্দকাকুর বাড়ি তিনসুকিয়া টাউনের একটু বাইরের দিকে। জায়গাটার নাম গেলাপুখুরি। জায়গাটা একদম জঙ্গলের গা ঘেঁষে। পশ্চিম দিকে দু-পা হাঁটলেই সেন্ট স্টিফেন্স চার্চ আর তার পরেই এথেলবাড়ি শিবমন্দির। মন্দির বাঁয়ে ফেলে লিম্বুগুড়ি চার্চ ছাড়ালেই মাগুরি বিল শুরু।

বলা বাহুল্য, সদানন্দকাকুকে আমি এখানে আসার আসল কারণটা জানাইনি। শুধু বলেছিলাম যে নেচার ফটোগ্রাফি আমার জীবনের একমাত্র শখ। এইদিকে কোনোদিন আসা হয়নি বলে আমি জঙ্গল ঘুরতে এসেছি।

সঙ্গে চিরসাথি আসাহি ক্যামেরাটা ছিলই, ফলে ওঁদের কনভিন্স করতে বেশি বেগ পেতে হয়নি। আমার প্ল্যান ছিল মাসখানেকের মধ্যে কোনো একটা পাত্তা লাগিয়ে কেটে পড়া। পরে চুপিচুপি ফিরে এলেই হল। ব্যাপারটা নিয়ে হইচই হোক সে আমি একদমই চাইনি।

সে যাই হোক। কাজকম্ম খারাপ না এগোবার অবশ্য আরও একটা কারণ আছে। কাকু আমার সঙ্গে একটি স্থানীয় লোককে পার্মানেন্টলি জুটিয়ে দিয়েছিলেন, নাম ছিল মংকু। ছোকরাকে প্রথম দিনেই আমার বেশ পছন্দ হয়ে যায়। সহজ-সরল লোক, তার ওপর গত বেশ কয়েকপুরুষ ধরেই ওর পরিবার এই অঞ্চলের বাসিন্দা। বাপঠাকুর্দার হাত ধরে ব্রহ্মপুত্রের প্রতিটি ঢেউ থেকে শুরু করে তিনসুকিয়ার জঙ্গলের প্রতিটি গাছ চিনেছে ও। এই জঙ্গলে ওর থেকে ভালো গাইড আর হয় না।

প্রথম দিন আমাকে দেখেই একটা আভূমি প্রণাম ঠুকল মংকু। তারপর বাঙালিঘেঁষা আসামিজ উচ্চারণে আমাকে জানাল যে এই অঞ্চলের যাবতীয় বনজঙ্গল তার নখদর্পণে। সে আশা করছে যে মালিকের খাস আদমির পছন্দমতো বেশ কিছু ছবি সে তুলিয়ে দিতে পারবেই পারবে।

পরের দিন থেকেই আমার কাজ শুরু হয়ে গেল। রোজ সাতসকালে উঠে খেয়েদেয়ে কাঁধে ক্যামেরাটা ঝুলিয়ে জঙ্গলে বেরিয়ে যাই, ফিরি দুপুর নাগাদ। দুপুরে খেয়েদেয়ে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে ফের জঙ্গল অনুসন্ধান। ফিরে আসতে হয় সন্ধ্যা হওয়ার আগেই।

তারপর সদানন্দকাকুদের সঙ্গে চা-তেলেভাজা সহযোগে বিপুল আড্ডা। রাতের এলাহি ডিনারের কথা তো ছেড়েই দিলাম।

এই করে করে যখন দিন পাঁচ-ছয় কেটেছে, তখনই ঘটল ঘটনাটা।

এই ক'দিনে আমি প্রায় তন্নতন্ন করে খুঁজেছি সারা জঙ্গলটা। মাগুরি বিল বেশ বড় বিল, চারিপাশে ঘন জঙ্গল। তার আশপাশে প্রায় তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছুই পাইনি। শুধু বাদ রয়ে গেছিল দক্ষিণ-পূর্ব দিকটা।

টাউন থেকে জঙ্গলে ঢোকার যে প্রধান রাস্তাটা, সেটা পশ্চিম দিকে। সেখান থেকে বিলের দক্ষিণ-পূর্বে যাওয়ার কোনো চলাচলের রাস্তা তো নেই-ই, তার ওপর মাঝে একটা বড় শুকনো নালা আছে। প্রথম থেকেই লক্ষ করেছিলাম যে ওদিকে যেতে মংকুর তীব্র অনীহা। ওদিকে যাওয়ার নাম শুনলেই ছোকরার চোখে-মুখে চকিতের জন্য একটা অস্বাভাবিক ছায়া খেলে যায়।

ওই রাস্তাটার কথা ভুলেই গেছিলাম। সাতদিনের শেষে নিষ্ফলা অভিযানের শেষে ফিরে আসছি, মনটা ব্যর্থতার বিষাদে তিক্ত হয়ে আছে, এমন সময় হঠাৎ করে আমার সেই শুকনো নালাটার কথা মনে পড়ে গেল। আরে যাহ, ওদিকে যাওয়া হল না তো!

কথাটা মংকুকে বলতেই দেখি সে ছোঁড়া অবাধ্য ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেল, ''মাফ করো দাদা, ওইদিকে যাব না।''

“সে কী? কেন?” আশ্চর্য হলাম, “এই যে সেদিন বললি মালিকের খাস আদমির পছন্দমতো সব ছবি তুলিয়ে দিবি আমায়?”

ঘাড় ত্যাড়া করে খানিকক্ষণ মাটির দিকে তাকিয়ে রইল ছোকরা, তারপর ভয়ার্ত স্বরে ইতিউতি তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, “ওদিকে যেতে পারব না গো দাদা, ওদিকে যাওয়া আমাদের বারণ আছে।”

“আমাদের মানে কাদের?”

“আমাদের সব্বার। দিবংগোঁয়্যা, বড়গোঁয়্যা, তেঙাপোনিয়া, সব্বার মানা ওদিকে যাওয়ার।”

এরা কারা সেসব বুঝলাম না। “কে মানা করেছে রে?” পালটা প্রশ্ন করলাম আমি।

“বড়দেওরি”, মংকুর ফিসফিস করে বলা কথাগুলো সন্ধের অন্ধকারে বড় অদ্ভুত শোনাল।

আমি একবার তাকালাম সেই জঙ্গলের দিকে। আশ্বিনের আকাশ থেকে সন্ধে নেমে আসছে দ্রুত। সারা আকাশ জুড়ে ঘরফেরত পাখিদের ডানা ঝাপটানো আর কলরবের আওয়াজে কান পাতা দায়। ছোটবেলা থেকেই আমার বিশেষ কিছু সেন্স বড় প্রবল, কোথাও কোনো অশরীরী বা অলৌকিক কিছু ঘটলে আগে থেকেই কিছু একটা আঁচ করতে পারতাম। সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হঠাৎই মনে হল, ওদিকে যেন কিছু একটা আছে। সেটা কী বুঝতে পারছি না, তবে স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি। যেন একটা একটা দুর্জ্ঞেয় শক্তি আমাকে চুম্বকের মতো ওদিকে টানছে। তার কোনো শুভাশুভ নেই, পাপ-পুণ্য নেই, উল্লাস বা হাহাকার নেই, শুধু এক উদাস রিক্ততা আছে, তাকে ভাষায় বর্ণনা করা খুব কঠিন।

আচ্ছন্ন স্বরে প্রশ্ন করলাম, “ওদিকে কী আছে মংকু?”

গলাটা একদম নামিয়ে ফিসফিস করে বলল মংকু, “কাউরীবুড়ির মন্দির।”

* * * *

সেদিন রাত্তিরের খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে নিজের ঘরে এসেছি, এমন সময় দরজায় ঠকঠক। দরজা খুলতেই দেখি সদানন্দকাকু দাঁড়িয়ে, সঙ্গে কাকিমা।

তাড়াতাড়ি দুজনকে ঘরে এনে বসালাম। কাকু প্রশ্ন করলেন, “কী ব্যাপার ভব, আজ তোমাকে কেমন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে? তোমার শরীর ভালো তো?”

আমি বললাম, “না না কাকু, আমার শরীর একদম ঠিক আছে। ও নিয়ে উদ্বিগ্ন হবেন না। আসলে যাওয়ার সময় চলে আসছে তো, তাই মনটা খারাপ হয়ে আছে।”

কাকিমা শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন, “ও মা, এ কী কথা? এই তো সেদিন এলে, এখনই এত যাই যাই কীসের? ভালো করে তো খাতিরযত্ন করাই হল না।”

হাত জোড় করে বললাম, “কাকিমা, এই ক’দিনে যা খাতিরযত্ন করেছেন, তাতে এই ক’দিনে নির্ঘাত আমার ওজন কম সে কম দশ কিলো বেড়ে গেছে। মা মারা গেছেন ছোটবেলাতেই, তারপর থেকে আজ অবধি এত আদরযত্ন কারও কাছ থেকেই পাইনি।”

কাকিমার চোখটা ছলছল করে এল, একটু ঝুঁকে এসে আমার মাথায় একবার হাত বুলিয়ে দিলেন।

কাকু গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, “তাহলে আর যাই যাই করছ কেন? অন্তত মাসখানেক থেকে যাও।”

হেসে ফেললাম, “কাকু, আপনি তো নিজেও সরকারি অফিসার। জানেনই তো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে এখন লোকের কীরকম অভাব। বড়সাহেব তো ছুটি দিতেই চাইছিলেন না। বহুকষ্টে তাঁকে রাজি করিয়ে তবেই এখানে আসতে পেরেছি। এখন যদি আর ছুটি বাড়াই, তাহলে আমার ওপরওয়ালা বোধহয় রামদা হাতে আমার খোঁজে এখানেই হানা দেবেন।”

“হুম”, এই বলে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন দুজনে, তারপর কাকু একটু ইতস্ততভাবে বললেন, “আচ্ছা বাবা, তুমি তো আয়ুর্বেদচর্চা করো বললে। তোমাদের শাস্ত্রে ডিপ্রেশন বা মনখারাপ সারাবার ওষুধ নেই?”

ডিপ্রেশন মানে ঠিক মনখারাপ নয়, ওটা একটা মেডিক্যাল কন্ডিশন। তবে সে ভুলটা আর কাকুকে ধরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম না। প্রশ্ন করলাম, ‘‘কিছু কিছু আছে কাকু, কিন্তু কেন? আপনার আবার ডিপ্রেশনের ওষুধের দরকার পড়ল কেন?’’

‘‘আমার না বাবা, মাধুরীর।’’

‘‘কেন কাকু? কী হয়েছে?’’

অল্প কথায় কাকু যা বললেন তা এইরকম—

মাধুরীর বিয়ে হয়েছিল প্রায় মাস সাত-আটেক আগে। লেখাপড়ায় মাধুরীর কোনোদিনই তেমন উৎসাহ ছিল না। গ্র্যাজুয়েশনের পর সে নিজেই আর পড়তে চায়নি। কাকুরা জোরজবরদস্তি করেননি, পালটি ঘরের সৎপাত্র দেখে বিয়ে দিয়ে দেন।

পাত্রের খোঁজ মাধুরীই দিয়েছিল। অনির্বাণের সঙ্গে ওর আলাপ কোনো এক বান্ধবীর বাড়িতে। তিনসুকিয়া থেকে আরেকটু উত্তরে গেলে সদিয়া বলে একটি জেলা আছে, সেখানেই ওদের তিনপুরুষের বাস। বাঙালি হলেও ওরা বহুদিন আসাম প্রবাসী। ছেলের চেহারাতেও একটু উত্তর-পূর্বের ছাপ আছে। তার অবশ্য অন্য একটা কারণ আছে। অনির্বাণের মা এখানকারই মহিলা।

অনির্বাণ ছেলে হিসেবে দেখতে শুনতে ভালো। চাকরি করে ডিব্রুগড়ে, কোনো এক চা-বাগানের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে। মাইনে খারাপ না। মা-বাবা মারা গেছেন অনেক আগেই। থাকার মধ্যে এক বিধবা দিদি, অনির্বাণের থেকে বছর পাঁচেকের বড়। তিনি ওর সঙ্গেই থাকেন। এ ছাড়া কাছের লোক বলতে এক মামা। এক কথায় নির্ঝঞ্ঝাট পরিবার।

কাকু ডিব্রুগড়ে লোক পাঠিয়ে গোপনে তত্ত্বতালাশ নিলেন। জানা গেল ছেলের স্বভাব-চরিত্র চমৎকার, নেশাভাং করে না, মেয়েঘটিত কোনো কেচ্ছাও নেই। ছেলের দাবিদাওয়াও বিশেষ কিছু নেই, শাঁখা-সিঁদুরেই খুশি।

কাকুরা শেষমেশ রাজি হয়ে গেলেন।

বিয়েটা হয়েছিল গত বছর ফাল্গুনে। কাকুরা যথাসাধ্য ভালোভাবে বিয়ের আয়োজন করলেন। কলকাতা থেকে অনির্বাণের কিছু দূরসম্পর্কের আত্মীয়স্বজনরা এলেন। ওর কলেজের বেশ কিছু বন্ধুবান্ধবও এল। বেশ হইহই হল কয়েকদিন।

বিয়ের পরপরই ওরা চলে গেল ভুটানে, হানিমুন করতে। ফিরে এল হপ্তাখানেক বাদে। তারিখটা এখনও মনে আছে কাকুর, বিশে ফেব্রুয়ারি। শিবরাত্রির ঠিক দু'দিন আগে।

ফিরে আসার পরদিনই মাধুরী বাপের বাড়ি চলে আসে। কথা ছিল শিবরাত্রির পরের দিন মাধুরী সদিয়া চলে যাবে। তারপর কয়েকদিন ওখানে কাটিয়ে ডিব্রুগড়, অনির্বাণের কর্মস্থলে।

এই ক'দিন অনির্বাণের দিদি বাড়ি ছিলেন না, মৃত স্বামীর কিছু পেনশন সংক্রান্ত কাজে গুয়াহাটি গেছিলেন। তবে যেদিন অনির্বাণরা ফিরে আসে, তার আগের দিনই কাজকর্ম মিটিয়ে সদিয়া চলে আসেন তিনি। কামাখ্যা থেকে আনা একটি পবিত্র সিঁদুরের কৌটো উপহার দেন মাধুরীকে।

আসল কাহিনি শুরু ঠিক শিবরাত্রির পরের দিন থেকে।

তেইশে ফেব্রুয়ারি, মানে যেদিন মাধুরীর বেরোনোর কথা, সেইদিন দুপুর থেকে হঠাৎ করেই মাধুরীর প্রচণ্ড শরীর খারাপ। স্নান করে, দুপুরের খাওয়া সেরে সবে বিছানায় শুয়েছে সে। হঠাৎ করে ধুম জ্বর, সেই সঙ্গে ঠকঠক করে কাঁপুনি। দেখতে দেখতে থার্মোমিটারের পারদ পৌঁছে গেল একশো তিন ডিগ্রিতে! গা যেন পুড়ে যাচ্ছে মেয়ের, আর তার সঙ্গে সমানে চলছে প্রলাপ বকা।

অবস্থা আরও খারাপ হল সন্ধের দিকে। সারা শরীর অবশ হয়ে এল মাধুরীর। বিছানা থেকে মাথা তোলা তো দূরস্থান, মুখ দিয়ে কোনো কথাই ফুটছে না। দেখে মনে হচ্ছে ধীরে ধীরে সারা শরীর যেন প্যারালাইজড হয়ে যাচ্ছে। সারা গায়ে চাকা চাকা দাগ। দুটো চোখই জবাফুলের মতো লাল। জলপট্টি দিতে দিতে ক্রমাগত

কেঁদে চলেছেন কাকিমা, আর মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করছেন। স্থানীয় ডাক্তারবাবুকে এত্তেলা দেওয়া হয়েছিল। তিনি এসে একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে বলে গেছেন এতে যদি অবস্থার উন্নতি না হয়, তাহলে রাত পোহালেই গুয়াহাটি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সে রাতটা বাড়ির প্রতিটি মানুষ সাংঘাতিক উদ্বেগে ছিলেন। কেউ দাঁতে কুটোটি কাটেননি। পাড়াপ্রতিবেশীরা পালা করে খোঁজ নিয়ে যাচ্ছেন। প্রায় অচৈতন্য মাধুরীর মাথায় জলপট্টি দিতে দিতে কেঁদে ভাসাচ্ছেন কাকিমা। ওদিকে অনির্বাণের বাড়িতে ফোন করা যাচ্ছে না, লাইনে গণ্ডগোল। অত রাতে সদিয়াতে কাউকে পাঠানোও সম্ভব নয়। একে রাস্তাঘাট ভালো না, তার ওপর সন্ত্রাসবাদীদের উৎপাত তো আছেই। মোটমাট সব মিলিয়ে সে এক ক্যাডাভ্যারাস অবস্থা।

কিন্তু পরের দিন আরেক চমক!

পরের দিন ভোরবেলা অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে বাড়ি ফিরে কলিং বেলের সুইচ টিপেছেন সদানন্দকাকু, দরজা খুলে দিল মাধুরী স্বয়ং! কাকু তো একেবারে হতভম্ব! কাকিমা জলপট্টি দিতে দিতে শেষরাতে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তিনিও দরজা খোলার আওয়াজ পেয়ে উঠে এসে এই দৃশ্য দেখে অবাক! মাধুরীর যাবতীয় রোগবালাই ম্যাজিকের মতোই একেবারে ভ্যানিশ! একদম ঝরঝরে তকতকে মেয়ে। হাসিমুখে বলল, ''যাদবকাকুকে গাড়ি বার করে রাখতে বলো বাবা। দুপুরের খাওয়াটা সেরেই ও বাড়ি চলে যাই।''

কাকিমা ঠাকুর ঠাকুর করে মাথায় হাত ঠেকালেন। এতদিন ধরে বাড়িতে গোবিন্দের নিত্যসেবা করছেন সে কি এমনি এমনি? ভক্তির একটা জোর নেই?

তারপর ঠিক এক সপ্তাহ। ঠিক এক সপ্তাহ বাদে মেয়ে তার যাবতীয় জিনিসপত্র দু-দুটো ঢাউস স্যুটকেসে বোঝাই করে ফিরে এল এ বাড়িতে। বাড়ির দরজায় সে দুটো নামিয়ে দিয়ে থমথমে মুখে সদানন্দকাকুকে বলল, ''আমি ফিরে এলাম বাবা। আমাকে রাখতে হয় রাখো, ফেলতে হয় ফেলো, কিন্তু আমি কিছুতেই আর ও বাড়ি ফিরে যাব না।''

এই পর্যন্ত বলে আঁচলে মুখ ঢাকলেন কাকিমা, ''ওই এক কথা বলে সেই যে ঘরে ঢুকল, তারপর থেকেই মেয়েটা কেমন যেন হয়ে গেছে। যতই জিজ্ঞেস করি, কী হয়েছে মা, কেন এখানে চলে এলি সে নিয়ে কিছু বল আমাদের! বনিবনা হচ্ছে না? অনির্বাণের সঙ্গে অন্য কোনো মেয়ের সম্পর্ক আছে? টাকাপয়সা বা অন্য কোনো কিছু চাইছে? অথবা অন্য কোনো অত্যাচার যা আমাদের মুখ ফুটে বলতে পারছিস না? কিন্তু মেয়ে কিছুই বলছে না বাবা।''

কাকুদের উদ্বেগের কারণটা বুঝলাম। হওয়ারই কথা, হাজার হোক একমাত্র মেয়ে, ধুমধামের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। তার মাসখানেকের মধ্যেই যদি তাকে তার নিজের সাজানো সংসার ছেড়ে ফিরে আসতে হয় তাহলে চিন্তার কারণ থাকে বই কি!

''আপনারা অনির্বাণের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেননি?'' আমি প্রশ্ন করেছিলাম।

''করেছিলাম বই কি! তাকে ফোন করে কথা বলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। কিন্তু অর্ধেক সময় হয় তার অফিস বা বাড়ির ল্যান্ডলাইন কাজ করে না, বা করলেও কেউ ফোন তোলে না।''

''তারপর?''

''তারপর'', এই বলে কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে চুপ রইলেন কাকিমা। তারপর মুখ তুলে বললেন, ''আমরা গেছিলাম ডিব্রুগড়ে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও অনির্বাণের দেখা পাইনি।''

''আর ওদের বাড়ি? সদিয়াতে যাননি?''

''গেছিলাম বই কি!''

''তাহলে?''

''দরজা বন্ধ ছিল। আমাদের অনেক কড়া নাড়াতেও কেউ দরজা খোলেনি।''

শুনে পুরো ব্যাপারটাই বেশ আশ্চর্যজনক লাগল। তখনও অবধি অবিবাহিত থাকলেও চেনাপরিচিতদের মধ্যে বেশ কিছু সাংসারিক অশান্তি, পারস্পরিক মনোমালিন্য, এমনকি ডিভোর্স হতেও দেখেছি। সব জায়গায় দেখেছি যে ঘুরেফিরে সেই কয়েকটা চেনা ইস্যুই বারবার ফিরে আসে। কিন্তু এখানে কেসটা বেশ আশ্চর্যের। এমন কী ঘটেছে যে মাধুরী কাউকে, এমনকি তার মা-বাবাকেও জানাতে পারছে না?

''সেই থেকে মেয়েটা শুকনো মুখে ঘুরে বেড়ায় বাবা। চোখের সামনে দিন দিন কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। ভালো করে খায় না, গান শোনে না, হাসি-ঠাট্টা নেই। মা হয়ে কী করে সহ্য করি বলো'', চোখে আঁচল চাপা দিলেন কাকিমা।

কাকুও দেখি মাথা নীচু করে বসে আছেন। তারপর মুখ তুলে বললেন, ''আমরা বেশ কিছু সাইকিয়াট্রিস্ট দেখিয়েছিলাম, বুঝলে। কিন্তু কেউই বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেননি। অন্তত যদি ওর এই ডিপ্রেশনটা কাটে, মুখ ফুটে আমাদের জানায় যে কী হয়েছে, তাহলেও কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারি। চার-পাঁচ মাস হয়ে গেল মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে না। এদিকে আত্মীয়স্বজন আছে, পাড়াপড়শি আছে, তাদেরকে আর কতদিনই বা মিথ্যে বলে ঠেকিয়ে রাখি বলো? ইতিমধ্যেই এদিক-ওদিক কানাকানি শুরু হয়েছে। আমাদের মান-সম্মানেরও তো একটা ব্যাপার আছে।''

তখন আমার অল্প বয়েস। তা ছাড়া রহস্যজনক ব্যাপারের দিকে চিরকালই আমার একটা আলাদা আগ্রহ ছিল। মনস্থির করে নিলাম, এই রহস্যের শেষ না দেখে আমি ছাড়ব না। তা ছাড়া কৃতজ্ঞতাবোধ বলেও তো একটা ব্যাপার আছে।

কথাটা কাকুকে জানিয়ে দিলাম। এও বললাম যে কাল বিকেলে আমি একবার মাধুরীর সঙ্গে আলাদা করে কথা বলতে চাই।

* * * *

পরের দিন সকাল এগারোটা নাগাদ যখন আমি বাড়ি থেকে বেরোলাম তখনই মাথার ওপর রোদ্দুর বেশ চড়া। পিঠে একটা ছোট রুকস্যাক, তাতে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর। কোমরে একটা জাঙ্গল নাইফ, একটা পয়েন্ট টু টু বোরের রিভলভার আর পাউচ ব্যাগে আসাহি ক্যামেরাটা। এদিকে আবার বিকেলের দিকে বেশ ঠান্ডা পড়ে। তাই রুকস্যাকে একটা সোয়েটারও আছে। পরনে জংলা ছাপের টাইট টিশার্ট আর কর্ডরয়ের ট্রাউজার, পায়ে মোটা হিলের হান্টিং বুট।

মংকুকে ইচ্ছে করেই সঙ্গে নিইনি। জানতাম যে যদি ওকে জানাই কোথায় যাচ্ছি, তাহলে আমার যাওয়াটা ভেস্তে যাওয়া অবধারিত। আমার মন বলছিল ওই কাউরীবুড়ির মন্দিরই আমার অভীষ্ট লক্ষ্য। ওখানেই গোলকপুষ্পর খোঁজ পাব।

তবে কাজটা যে প্রভূত ঝুঁকির সে নিয়ে সন্দেহ নেই। আসামের জঙ্গলের মতো বিপদসংকুল জায়গা কমই আছে। লেপার্ড বা পাইথনের কথা ছেড়েই দিলাম, কখন যে ঘাসের জঙ্গল থেকে শিং উঁচিয়ে তেড়ে আসবে হিংস্রে বুনো মোষ, বা হিলহিলে মাথা তুলে দাঁড়াবে ব্যান্ডেড ক্রেইট, সেসব সাধারণ মানুষের ধারণার বাইরে। এতদিন এসব মংকুই সামলাত। কোন রাস্তা নিরাপদ, কোন পথে গেলে বুনো হাতির দলের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা কম, কোথায় গেলে নিরাপদ দূরত্ব থেকে দুটো আঠেরো ফুট লম্বা কিং কোবরার সংসারযাপনের ছবি তুলতে পারব, সেসব ওর একেবারে নখদর্পণে ছিল।

কিন্তু আজ আমি একা।

রাস্তা এই ক'দিনে বেশ ভালোমতোই চেনা হয়ে গেছিল। ঘণ্টাখানেক বাদে যখন সেই শুকনো নালার কাছে এসে দাঁড়ালাম তখন সূর্য ঠিক মধ্যগগনে। মাথার ওপর আশ্বিনের পরিষ্কার আকাশ। বেশ একটা মৃদুমন্দ হাওয়া বইছে। পাখপাখালির ডাক ছাড়া দূর দূর অবধি আর কোনো প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই।

বলতে দ্বিধা নেই, শুকনো নালাটার সামনে বুনো ঘাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গা-টা একটু শিরশির করে উঠল। তার একটা কারণ যদি হয় মংকুর কালকের কথাগুলো, আরেকটা হচ্ছে যতই এগোচ্ছিলাম নালাটার দিকে, মনে হচ্ছিল জঙ্গল জুড়ে যেন একটা চাপা নৈঃশব্দ্য নেমে আসছে। মানে ধীরে ধীরে আমার আর জঙ্গলটার মধ্যে একটা পর্দা গজিয়ে উঠছে, সেটা পেরিয়ে ওদিককার আওয়াজ আর আমার কানে পৌঁছোচ্ছেই না।

নালাটার কাছে পৌঁছে একবার পেছনে তাকালাম। আমার আসার সুঁড়িপথটা ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে। বুনো ঘাসের ডগাগুলো ফণা তোলা সাপের মতো দুলছিল। কাউকে ছোবল মারবে নাকি?

মাথাটা সবে ঘুরিয়েছি, এমন সময় শাল, সেগুন আর গামার গাছের দুর্ভেদ্য পাঁচিলের মধ্য দিয়ে হঠাৎই একটা দমকা হাওয়া বয়ে গেল। আমার মনে হল কেউ যেন কান্নার সুরে ফিসফিস করে বলে উঠল, ফিরে আয়, ফিরে আয়...এখনও সময় আছে...ফিরে আয়...

চোখটা একবার বন্ধ করেই ফের খুললাম আমি। কী সব আজেবাজে ভাবছি! গোলকপুষ্প খুঁজে পাওয়ার উত্তেজনায় মাথাটা আমার খারাপ হয়ে গেল নাকি?

জাঙ্গল নাইফটা হাতে নিয়ে নালাটায় নামলাম। সঙ্গে সঙ্গে টের পেলাম যে শুকনো নালার ঘাসে বাতাসের একটা দমকা দীর্ঘশ্বাস খেলে গেল।

আর তারপরেই সব চুপ!

চুপ মানে একদম চুপ। হঠাৎ করেই কে যেন বাতাসের টুঁটি টিপে ধরেছে, আশ্বিনের ঝিরিঝিরি বাতাস একেবারেই উধাও। জঙ্গলের আওয়াজটা কমে আসতে আসতে একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল।

বুকসমান উঁচু ঘাস ঠেলে নালাটা পেরোতে সময় লাগল মিনিট তিনেক। হাঁচোড়পাঁচোড় করে ওপরে উঠে একবার ঘুরে দাঁড়ালাম। ব্যাপারটা কী? সব কিছু এরকম ঠান্ডা মেরে গেল কেন?

কই কোথাও কিছু নেই তো! সব স্বাভাবিক। শুধু ওই একটাই ব্যাপার, জঙ্গলের পাখির ডাক বা অন্য কোনো আওয়াজ নেই, আর বাতাসে একটা বিষণ্ণ গম্ভীর ভাব ছেয়ে আছে।

ব্যাপারটা কী? এদিকটায় পাখি-টাখি বা অন্যান্য জন্তুজানোয়ার নেই নাকি? এরকম তো হওয়ার কথা নয়!

আমার ভাবনাটা যে ভুল সেটা টের পেলাম সঙ্গে সঙ্গেই।

আমার ঠিক সামনে ছিল একটা পুরোনো শ্যাওলা ধরা অগুরু গাছ। সেদিকে এক পা এগোতেই দেখি কোথা থেকে একটা কাক উড়ে এসে বসল তার ডালে।

শুধু বসল।

ডাকল না।

তার দৃষ্টি সোজা আমার দিকেই।

লক্ষ করলাম কাকটার চোখদুটো কালো নয়। লাল, হলদেটে লাল।

কাকটাকে উপেক্ষা করেই পরের পা ফেললাম। এবার ডানদিকের গামার গাছের ডালে উড়ে এসে বসল আরেকটা কাক। ঠিক আগেরটার মতোই। এও ডাকল না। হলদেটে লাল চোখ মেলে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। একটু আশ্চর্য হলাম। এ আবার কীরকমের কাক?

পরের পা ফেললাম। এবার বাঁদিকের শিশুগাছের ডালে উড়ে এসে বসল আরেকটা কাক। সেও আগের দুটোর মতোই হলদেটে লাল চোখ মেলে চেয়ে রইল আমার দিকে।

এবার একটা অদ্ভুত জিনিস শুরু হল। এক পা এক পা করে এগোচ্ছি, আর দেখছি আশেপাশের প্রতিটা গাছের ডালে এক একটা করে কাক উড়ে এসে বসছে। তাদের প্রত্যেকের দৃষ্টি আমার দিকে, তাদের প্রত্যেকের চোখের রং এক।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, একটা পথের আভাস পাওয়া যাচ্ছে না? মনে হল সেটা এই সাম্প্রতিক কালেই তৈরি হয়েছে। তার মানে কি অলরেডি অন্য কেউ কাউরীবুড়ির মন্দিরের খোঁজ পেয়ে গেছে? অর্থাৎ আমার একজন কম্পিটিটর ইতিমধ্যেই নেমে পড়েছে বাজারে? এত দূর এসে তরী ডুববে নাকি?

ব্যাপারটা মাথায় আসতেই মনে একটা মরিয়া সাহস ফিরে পেলাম। জাঙ্গল নাইফটা বাগিয়ে এগিয়ে পড়লাম সেই রাস্তা ধরে।

আজ এতদিন বাদেও সেই দুপুরটার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সম্পূর্ণ অচেনা-অজানা একটা জঙ্গল। একটা ঝিমধরা নিঝুম নিস্তব্ধতা চারিদিকে ছেয়ে আছে। তার মধ্য দিয়ে আমি একা একটা জাঙ্গল নাইফ হাতে ডালপালা ছাঁটতে ছাঁটতে এগোচ্ছি।

একটা কথা অবশ্য ভুল হল। আমি একা নই। ওরাও আছে।

আমি খেয়াল করছিলাম যে আমার এগোবার সঙ্গে সঙ্গে সেই কাকেদের ঝাঁকও আমার সঙ্গে সঙ্গে এই ডাল, ওই ডাল করে এগোচ্ছিল। তাদের কেউ একবারও ডাকছে না। শুধু আমার পথের আশেপাশের কোনো গাছের ডালে একটু একটু করে উড়ে গিয়ে বসছে আর আমার দিকে ফিরে সেই ঠান্ডা হলদেটে লাল চোখে তাকিয়ে আছে।

এইভাবে মিনিট দশ-পনেরো এগোনোর পর হঠাৎ করেই একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছোলাম। জায়গাটা একটা চাতাল মতো। খানিকটা গোলমতো ফাঁকা জায়গা, যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার ঠিক উলটো দিকে বেশ কয়েকটা নিমগাছ একসঙ্গে জড়ো হয়ে একটা বিশাল চাঁদোয়া মতো বানিয়েছে। আর তার ঠিক নীচে পাথরের তৈরি পুরোনো একটা মন্দির।

কাউরীবুড়ির মন্দির!!

এতক্ষণের পরিশ্রমে আর উত্তেজনায় দরদর করে ঘামছিলাম। ওখানেই ধুপ করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম। মাথাটা নীচু করতেই বুকের ধড়াস ধড়াস আওয়াজটা নিজের কানেই দ্রিমিদ্রিমি হয়ে বেজে উঠল। আর কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। তার পরেই হয়তো সাত রাজার ধন এক মানিক আমার হাতে!

মিনিটখানেক ওইভাবে বসে থাকার পর মাথা তুলে উঠে দাঁড়ালাম। বেল্টটা টাইট করে বেঁধে আর জাঙ্গল নাইফটা খাপে ঢুকিয়ে নেমে পড়লাম চাতালে। তারপর লম্বা লম্বা পায়ে জায়গাটা অতিক্রম করে মন্দিরটার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালাম।

পাথরের মন্দির, আকারে বেশ বড়। আমাদের পরিচিত ভারতীয় একচালা বা দোচালা মন্দির থেকে বেশ আলাদা। আদল অনেকটা তিব্বতি বা চিনা মন্দিরের মতো। মন্দিরের সারা গায়ে দক্ষ হাতে পাথর কুঁদে অপূর্ব অলংকরণ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মন্দিরের ঠিক সামনে একটা হাড়িকাঠও নজরে এল। মানে এককালে বলিদানের ব্যবস্থাও ছিল নিশ্চয়ই। নরবলিও হত কি?

ধীর পায়ে মন্দিরের ভেতরে গিয়ে উঠলাম। ওঠার আগে হান্টিং বুটটা খুলে রাখতে ভুললাম না যদিও। হাজার হোক এত বছরের সংস্কার। তা ছাড়া আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছিল যে এই মন্দির এখনও জাগ্রত, এখানে শ্রদ্ধাবনত ভাবে, মাথা নীচু করেই ঢুকতে হবে।

ঢোকার আগে একবার বাইরের দিকে তাকিয়ে নিলাম। গোটা চত্বরটা ঘিরে থাকা প্রতিটি গাছের ডালে অন্তত গোটা পঞ্চাশেক কাক বসে। কেউ ডাকছে না। এবং প্রত্যেকে তীক্ষ্ণ ঠোঁট উঁচিয়ে, হলদেটে লাল চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

কপাল ঠুকে ঢুকে পড়লাম মন্দিরের ভেতরে, যা হয় হবে। যার জন্য এত কষ্ট করে এত বড় ঝুঁকি নিয়েছি, সেই গোলকপুষ্প আছে কি নেই, এই মুহূর্তে সেটাই একমাত্র বিচার্য। বাকিটা পরে দেখা যাবে না হয়।

আলো থেকে অন্ধকারে ঢোকার ফলেই হয়তো প্রথমে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। চোখটা সয়ে আসতে খানিকটা সময় নিল।

প্রথমেই লক্ষ করলাম যে মন্দিরের মধ্যে মূর্তি বলতে কিছু নেই। দরজার উলটোদিকের দেওয়ালে একটা দেবীমূর্তির রিলিফ, পাথরে কুঁদে ফুটিয়ে তোলা। আর ঠিক তার সামনে মেঝেতে গাঁথা আছে একটা পাথরের হাড়িকাঠ। হাড়িকাঠের ঠিক সামনে একটা গর্ত। সেই গর্ত দিয়ে কী যেন একটা উঁকি দিচ্ছে।

রুকস্যাক থেকে টর্চটা বার করে উলটোদিকের দেওয়ালে ফেললাম। এই কি কাউরীবুড়ির মূর্তি?

মূর্তিটা একটু অদ্ভুত। দেবীর কোনো বাহন নেই, পদ্মাসনে বসে আছেন। দেহের তুলনায় মুখটা একটু বড়, চোখদুটো আরও অস্বাভাবিক রকমের বড়। পাথর কুঁদে কুঁদে উড়ন্ত চুল বোঝানো হয়েছে। মাতৃমূর্তির মুখে সচরাচর একটা স্নিগ্ধ স্নেহচ্ছায়া লেগে থাকে। কিন্তু এঁর মুখে একটা তিক্ত, নিস্পৃহ, উদাসীন ভাব ফুটে আছে। সেই দৃষ্টিতে ভালোবাসা নেই, স্নেহ নেই, প্রেম নেই, মোহ নেই। কিচ্ছু নেই।

এবার টর্চটা ঘোরালাম মেঝের দিকে। রিসেন্টলি কিছু পুজো-আচ্চা হয়েছে বোঝা যাচ্ছে, কারণ হাড়িকাঠের সামনে পড়ে আছে জবাফুল, আতপ চাল আর সিঁদুরলেপা অশ্বত্থের পাতা। আর তার সামনের গর্ত থেকে উঁকি মারছে ওটা কী?

ওদিকে আলো ফেলতেই হৃৎপিণ্ডটা একলাফে গলার কাছে উঠে এল। একটা লতানে গাছ বেরিয়ে আছে গর্তটা থেকে। পানপাতার মতো বড় বড় পাতা। আর তার ডগায় ফুটে আছে একটি কুঁড়ি। কুঁড়ির ঠিক মাথার ওপর একটি বড় পাতা সাপের ফণার মতো উঁচিয়ে আছে।

হাতটা থরথর করে কাঁপছিল। এটাই যে সেই গোলকপুষ্প তাতে কোনো ভুল নেই। মনে মনে বর্ণনাটা একবার আউড়ে নিলাম। একেবারে খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। পুথিতে এও বলা আছে যে ওই কুঁড়ি ফুটতে এখনও অনেক দেরি, ফুটবে আষাঢ় মাসে, অম্বুবাচীর দিন। সেদিন পাতাগুলো শুকনো হয়ে ঝরে যাবে, আর ডগায় দুলবে ছাই ছাই রঙের এই আশ্চর্য ফুল। তার সৌরভে নাকি সমস্ত বনভূমি আমোদিত হয়ে ওঠে। মানুষের মনে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে কামনার সহস্রশীর্ষ কালসর্প। সেই রাতে নাকি স্বয়ং কামদেব আর ধন্বন্তরি এই মর্তভূমিতে নেমে আসেন এই দেবভোগ্য ফুল সংগ্রহ করতে। তার অর্ধেক দিয়ে তৈরি হয় জীবনদায়ী ঔষধি, বাকি অর্ধেক দিয়ে উদ্দীপক কামরস!

আমি অবশ্য এতশত ভাবছিলাম না। আমি জানি যে সমস্ত পৌরাণিক কাহিনির পেছনে লুকিয়ে থাকে কোনো না কোনো ঐতিহাসিক বা জাগতিক সত্য। এইসব গল্পকথার মানে একটাই, এই ফুলের রসের কেমিক্যাল কম্পোনেন্টের দুটি বিশেষ ধর্ম আছে। একটি মেডিসিনাল, আরেকটি অ্যাফ্রোডিজিয়াক।

ইতিমধ্যেই আমি আমার কর্তব্য স্থির করে নিয়েছি। লতাকে এখান থেকে তুলে অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে পরিচর্যা করে বাঁচিয়ে রাখার প্ল্যান-প্রোগ্রাম ইত্যাদি করাই আছে। ইতিমধ্যেই এখানকার মাটির কম্পোজিশন জোগাড় করে রেখেছি। এর পরে এখন একটাই কাজ বাকি, যত্ন সহকারে একে এখান থেকে তুলে একবার কালিম্পং-এ নিয়ে যাওয়ার ওয়াস্তা, ব্যস। আমার এক চেনা ভদ্রলোকের গ্রিন হাউস আছে কালিম্পং-এ। যে-কোনো লতা বা গুল্মকে বাঁচিয়ে রাখা এবং তার বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা করায় সেই ভদ্রলোক প্রায় ধন্বন্তরি। আমার আয়ুর্বেদিক গবেষণায় উনি যথেষ্ট সাহায্য করেন।

ধীরে ধীরে রুকস্যাকটা পিঠ থেকে নামিয়ে আমার আসাহি ক্যামেরাটা বার করলাম। এখান থেকে লতাটাকে যথাবিহিত যত্নসহকারে উপড়ে নেওয়ার আগে তার কয়েকটা ফোটো তুলে নেওয়া আবশ্যক।

ক্যামেরার অ্যাপার্চার ইত্যাদি ঠিক করছি, ঠিক এমন সময়ে আমার পিছন থেকে একটি তীক্ষ্ণ মহিলা কণ্ঠের চিৎকার ভেসে এল, ‘‘কে, কে ওখানে?’’

* * * *

আমি এমন চমকে উঠেছিলাম যে হাত থেকে ক্যামেরাটা পড়ে যাচ্ছিল প্রায়। কোনোমতে সামলেসুমলে উঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি একজন মহিলা, ঠিক দরজার কাছটায় দাঁড়িয়ে। হাতে একটা বেতের চুপড়ি, দু’চোখে বিপুল বিস্ময় আর ক্রোধ।

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, ‘‘এ কী! আপনি কে? কোথা থেকে এলেন?’’

মহিলা দ্রুতপায়ে এসে বেতের চুপড়িটা নামিয়ে রাখলেন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ সর্পিণীর মতো হিসহিস করে প্রশ্ন করলেন, ‘‘কে আপনি? এখানে এলেন কী করে? কে রাস্তা দেখাল আপনাকে?’’

ভদ্রমহিলার উচ্চতা সাড়ে পাঁচ ফুট মতো। কটা চোখ, চওড়া চোয়াল, আর ভাঙা গাল। উপরের পাটির দাঁতগুলো একটু বড়। পরনে সাদা শাড়ি, সাদা ব্লাউজ। বয়েস বেশি না, পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যেই হবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই মহিলার মাথার চুল সাদা হতে শুরু করেছে। হিসেব মতো মহিলার এখনও যথেষ্ট যৌবনবতী থাকার কথা। কিন্তু তার বদলে ছড়ানো শুকনো আঙুল, কাঠ কাঠ হাত-পা এবং সারা মুখ জুড়ে রুক্ষ, শুষ্ক, বিরক্ত একটা ভাব। সব মিলিয়ে মহিলার উপস্থিতিটাই খুব কর্কশ ও অস্বস্তিকর।

নমস্কার করে বললাম, ''আমার নাম ভবতারণ চট্টোপাধ্যায়, বাড়ি কলকাতা। এখন অবশ্য শিলিগুড়িতে থাকি। এখানে এসে উঠেছি...''

''আপনার ঠিকুজি জানতে চাইনি'', ধমকে উঠলেন ভদ্রমহিলা, ''আপনি এতদূর এলেন কী করে? আর এ জায়গার খোঁজই বা পেলেন কী করে?''

''হেঁটেই এলাম। উড়ে আসার তো কোনো রাস্তা নেই বলেই দেখছি।'' অল্প হাসার চেষ্টা করলাম।

''আপনি ঠাট্টা করছেন? আপনার স্পর্ধা তো কম নয়।'' দু'চোখ ধক করে জ্বলে উঠল মহিলার। ''কে আসতে বলেছে আপনাকে? জানেন কোথায় এসেছেন আপনি?''

''জানি বই কি। কাউরীবুড়ির মন্দির। না জেনে আর আসব কেন বলুন?''

মুহূর্তের মধ্যে মহিলার মুখের মধ্যে পরপর বিস্ময়, ভয় আর ক্রোধের ছায়া খেলে গেল। তারপর বললেন, ''কেন এসেছেন আপনি? কী চাই এখানে?''

আসার কারণটা বলেই ফেললাম। আর লুকিয়ে লাভ নেই।

আমার কথা শুনে মহিলার কটা চোখদুটো ফের জ্বলে উঠল, দাঁতে দাঁত চিপে বললেন, ''আপনার সাহস তো কম নয়! আপনি কাউরীবুড়ির ফুল তুলে নিয়ে যেতে এসেছেন? আপনি জানেন কত পবিত্র এই ফুল? সেই ফুল নিয়ে ব্যবসা করবেন? আপনার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলা উচিত।''

ভাবলাম উলটে কটা কড়া জবাব দিই। তারপর ভাবলাম, থাক, এরকম পরিস্থিতে আগেও বেশ কয়েকবার পড়তে হয়েছে। অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে এসব ক্ষেত্রে চুপ করে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। রাস্তা যখন চিনে গেছি তখন এখানে বারবার আসা যাবে।

চুপ করে থাকায় ফল হল। হিসহিসানি কমল খানিকটা, ''কে রাস্তা দেখাল আপনাকে?''

মংকুর কথাটা স্বীকার করলাম। এমনকি সে যে বারণ করেছিল বারবার সেটাও জানালাম।

মহিলা খরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর বললেন, ''গত আড়াইশো বছর ধরে একমাত্র আমাদের পরিবারের মেয়েরা ছাড়া এই মন্দিরে আর কেউ জীবন্ত পা রাখেনি। রাখলেও বেঁচে ফিরে যায়নি। আপনি এলেন কী করে এখানে?''

মহিলা মনে হয় উন্মাদ। আড়াইশো বছর ধরে ওঁদের পরিবারের মেয়েরা ছাড়া কেউ মন্দিরে পা রাখেনি? এটা বিশ্বাসযোগ্য?

এখন কথা হচ্ছে যে উন্মাদের সঙ্গে তর্কে জড়াতে নেই। আমি চট করে মন্দিরের গায়ে আঁকা কাউরীবুড়ির রিলিফটার দিকে একটা প্রণাম ঠুকে দিলাম, ''সে একমাত্র মা কাউরীবুড়িই জানেন। তাঁর আশীর্বাদ ছাড়া কি এখানে আসতে পারি বলুন? মা নিজেই পথ দেখিয়ে এনেছেন আমাকে।''

দেখানে ভক্তিটায় বোধহয় কাজ হল। মহিলা সাপের চাউনিতে আমার দিকে চেয়ে বললেন, ''আপনার কোনো ক্ষতি করছি না আপাতত, নিজের অজান্তে ভুল করে ফেলেছেন ভেবে ছেড়ে দিচ্ছি। এখন এই কোণে চুপচাপ ভদ্রভাবে বসে থাকুন। আমার পুজো শেষ হলে আপনাকে জঙ্গলের বাইরে ছেড়ে দিয়ে আসব। আর হ্যাঁ, এই যে আপনি এখানে এসেছেন, এসব কথা যেন বাইরে প্রচার না হয়। কালই ফিরতি ট্রেন ধরে শিলিগুড়ি ফিরে যাবেন। তবে কোনো প্যাঁচ কষার চেষ্টা করবেন না কিন্তু, ফের যদি দেখেছি এদিকে আসতে তাহলে কিন্তু এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবেন না, এই বলে দিলাম।''

হাসতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলাম। পকেটে একটা রিভলবার, কোমরে একটা জাঙ্গল নাইফ নিয়ে ঘুরছি। মার্শাল আর্টও জানা আছে অল্পবিস্তর। তার পরেও যদি এই নিরস্ত্র মহিলা আমার প্রাণনাশের ধমকি দেন তাহলে তো...

''কথাটা বিশ্বাস হল না, তাই না?'' ভদ্রমহিলা দেখি আমার মনের কথাটা পড়ে ফেলেছেন। ঠোঁটের কোণ অদ্ভুতভাবে বাঁকিয়ে বললেন, ''দেখবেন আমি কী করতে পারি?'' তারপর বাইরের দিকে আঙুল তুলে নির্দেশ করলেন, ''তাকিয়ে দেখুন।''

জঙ্গলের দিকে তাকাতেই এক ধাক্কায় আমার হৃৎপিণ্ডটা প্রায় কণ্ঠার কাছে এসে থমকে গেল।

তাকিয়ে দেখি জঙ্গলের প্রতিটি গাছের মাথায় আর ডালে শুধু কাক আর কাক। এই কিছুক্ষণের মধ্যেই যেন রাজ্যের কাক হাজারে হাজারে এসে চারিদিকের সবকটা গাছের ডাল দখল করে ফেলেছে। এবং দখল করেছে এত নিঃশব্দে যে আমি তার আঁচ অবধি পাইনি। কোনো ডানা ঝাপটানোর শব্দ নেই, কোনো ডাকাডাকির শব্দ নেই। যেন কয়েকটা পাথরে কোঁদা মূর্তি চেয়ে আছে এদিকেই।

না, এদিকে না। শুধু আমার দিকে। তাদের হলদেটে লাল চোখগুলো সব আমার মুখের ওপরেই স্থির হয়ে আছে হাজার জোড়া সার্চলাইটের মতো। সেদিকে তাকিয়ে এই প্রথম একটা জিনিস অনুভব করলাম। সেই নিষ্পলক জ্বলন্ত চোখগুলোতে যেটা মিশে আছে সেটাকে বলে রাগ। প্রবল ঘেন্না মেশানো রাগ। আমার মনে হল যেন প্রতিটা কাকের চোখ থেকে ঝরে পড়ছে আমাকে খুবলে খাওয়ার প্রবল বাসনা। কেবলমাত্র অনুমতি নেই বলে ওরা চুপচাপ বসে আসে গাছের ডালে। নইলে এতক্ষণে...

বলতে নেই, ওই দৃশ্য দেখে দিনের বেলাতেও বুকটা ঠান্ডা হয়ে এল। এসব হচ্ছেটা কী?

পেছন থেকে সেই চাপা হিসহিস শব্দটা ভেসে এল ফের, ''কোনো চালাকি করার চেষ্টা করবেন না। তাহলে কিন্তু আপনার লাশটাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। চুপচাপ ওখানে দাঁড়ান। আমি বার করে নিয়ে না গেলে আপনি এই জঙ্গল থেকে জ্যান্ত বেরোতে পারবেন না।''

''কি...কি...কিন্তু আপনি কে?''

খানিকক্ষণ চুপ করে আমার দিকে চেয়ে রইলেন মহিলা। মনে হল বোধহয় ভাবছেন আমাকে উত্তর দেওয়াটা ঠিক হবে কি না। তারপর ধীরস্বরে বললেন, ''আমি এই মন্দিরের সেবায়েত, এখানকার বড়দেওরি।''

বড়দেওরি কথাটা কোথায় যেন শুনেছি মনে হল। কিন্তু তখন উত্তেজনায় মাথাটা এমন ঘেঁটে ছিল যে সেটা মাথায় এল না। প্রশ্ন করলাম, ''সেবায়েত? মাফ করবেন, কিন্তু আজ অবধি কোনো মহিলাকে মন্দিরের সেবায়েত হতে দেখিনি।''

মহিলা ততক্ষণে আমার দিকে পিছন ফিরে বেতের চুপড়ি থেকে পুজোর সরঞ্জাম নামিয়ে রাখতে শুরু করেছেন। সেখান থেকেই বললেন, ''শুনে না থাকলে শুনুন। সব কিছুরই তো প্রথমবার বলে কিছু হয়।''

পেটের মধ্যে অনেকগুলো প্রশ্নের বুজকুড়ি উঠছিল। একটু ইতস্তত করে প্রশ্ন করলাম, ''কিন্তু আমাকে যে বলা হল এই মন্দিরে আসা নাকি লোকের বারণ। মানে এখানে কেউ আসে না...''

''লোকেদের বারণ করা হয়েছে বলেই তারা আসে না। কারণ বুড়িমা পছন্দ করেন না যে কেউ তাঁকে বিরক্ত করুক।''

বারণ করলেই লোকে শুনছে, শুনে ভারী আশ্চর্য লাগল। এখানকার লোক এত বাধ্য নাকি? ভাবতে ভাবতেই মংকুর কথা মনে পড়ে গেল। ও-ই বলেছিল না যে বড়দেওরির বারণ আছে এদিকে আসার?

কথাটা বলতে মহিলার ঠোঁটে একটা আলগা হাসি খেলে গেল। তারপর ধীর স্বরে বললেন, ''ও ঠিকই বলেছে। ওদের বারণ আছে। শুধু ওরা কেন, বললাম যে, একমাত্র আমাদের পরিবারের মেয়েদের ছাড়া বাকি সবার জন্য এখানে আসা বারণ।'' বলে থামলেন তিনি, তারপর ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললেন, ''সরুন,

সরুন। আমাকে পুজোটা শেষ করতে দিন'', বলেই ব্যস্তসমস্ত পায়ে সেই দেওয়ালে গাঁথা অদ্ভুত মূর্তির সামনে গিয়ে বসলেন তিনি।

একমাত্র এঁদের ফ্যামিলির মহিলা ছাড়া অন্য কারও পক্ষে এখানে আসা কেন বারণ সেটা আমার মাথায় ঢুকল না। তবে এ নিয়ে আর বেশি জানার চেষ্টা করাটা উচিত হবে বলে মনে হল না। চুপচাপ মাটিতে বসে ভদ্রমহিলার পুজো করা দেখতে লাগলাম।

পুজোর পদ্ধতি বড় অদ্ভুত। প্রথমেই একটা বাটি থেকে রক্তচন্দন নিয়ে নিজের কপালে একটা অদ্ভুত সিম্বল আঁকলেন। তারপর ছোট মাটির প্রদীপে সর্ষের তেল ঢেলে তাতে সলতে দিয়ে প্রদীপ জ্বালালেন। একগোছা ধূপ ধরিয়ে বাঁশের তৈরি একটা ধূপদানিতে গাঁথলেন। সেসব সারা হলে কয়েকটা জবাফুল, পান-সুপারি, ভেজা চাল, শুকনো লংকা এসব বার করে মাটিতে রেখে পুজো শুরু করলেন।

পুজো করতে সময় লাগল আধঘণ্টাটাক। অর্ঘ্যদান শেষ হতেই মন্দিরের বাইরে বেরোলেন ভদ্রমহিলা। অবশ্য বেশিক্ষণের জন্য না, অল্প সময় পরেই বাঁ হাতে একটা দু-পা বাঁধা পায়রা ঝুলিয়ে নিয়ে এলেন। ডান হাতে একটা বড়ো হাত-দা।

এরপর ভদ্রমহিলা যেটা করলেন সেটা দেখে আতঙ্কে সিঁটিয়ে গেলাম আমি!

বাঁ হাতে পায়রাটাকে ধরে মাটিতে গাঁথা পাথরের হাড়িকাঠটার মধ্যে রাখলেন। তারপর সম্পূর্ণ অজানা একটা ভাষায় উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র বলতে বলতে হাতের দা-টা দিয়ে এককোপে পায়রাটার মুন্ডুটা কেটে ফেললেন। ফিনকি দিয়ে ওঠা রক্তে ভিজে গেল মহিলার শুকনো ফ্যাকাশে হাত দুটো। সাদা কাপড়ে ছিটকে এল রক্তের ফোঁটা।

মুন্ডুহীন পায়রাটা কিছুক্ষণ ছটফট করে নিথর আর নিস্তেজ হয়ে গেল। আর পায়রাটার রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল গর্তটার দিকে, যেখান থেকে উঁকি মারছে গোলকপুষ্পের লতা!

দৃশ্যটা দেখে আমার হাত-পা এমনই জমে গেছিল যে নড়তে বা কিছু বলতে পারছিলাম না। ইতিমধ্যেই কখন যে মহিলা হাত-টাত ধুয়ে পুজোর উপচার গুছিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন সেটা খেয়াল করিনি। সংবিৎ ফিরল যখন উনি আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, ''চলুন, আপনাকে জঙ্গলের বাইরে ছেড়ে দিয়ে আসি। আর হ্যাঁ, যা বললাম, কালই শিলিগুড়ি ফিরে যান, এদিকে আসার আর চেষ্টাও করবেন না যেন। কাউরীবুড়ির অনুচরেরা কিন্তু আপনাকে চিনে নিয়েছে। এখানে ফিরে আসার বা অন্য কোনো বদমাইশি করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলে তার ফল যে ভালো হবে না, সেটা আগেই বলেই দিলাম।''

যে রাস্তা ধরে এসেছিলাম সেই রাস্তা ধরেই ফিরতে হল। এবার কোনো কাকের দেখা পেলাম না। ততক্ষণে বিকেল পড়ে আসছিল।

মিনিট পনেরো হাঁটার পর ফের সেই নালার কাছে এসে পৌঁছোলাম। আগের বার যেখান থেকে নালাটা পেরিয়েছিলাম, ভদ্রমহিলা তার থেকে একটু দূরে হেঁটে গেলেন। দেখি কয়েকটা পুরোনো গাছ এপার-ওপার ফেলা আছে ব্রিজের মতো করে। তার মানে মহিলা এই পথেই যাতায়াত করেন। এদিক-ওদিক তাকাতে একটু দূরে প্রাচীন একটা ভাঙা কাঠের দেউড়িরও আভাস পেলাম।

নালাটা পেরোতেই আস্তে আস্তে পাখিদের ঘরে ফেরার শব্দ কানে আসতে লাগল। হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে পড়লাম, এতক্ষণ এসব শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম না কেন?

ভদ্রমহিলা আমার আগে আগে যাচ্ছিলেন। আমি থামতেই উনিও থেমে গেলেন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রায় ধমকে উঠলেন, ''কী হল, থামলেন কেন? চলুন। সন্ধে নামার আগে আপনাকে এই এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে। নইলে আমারও সাধ্য থাকবে না আপনাকে রক্ষা করার।''

''শব্দ...শব্দ...'' অস্ফুটে বললাম, ''এতক্ষণ আপনার কথা ছাড়া অন্য কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম না কেন?''

সন্ধে নেমে আসা আধো আঁধারের মধ্যে ভদ্রমহিলার চোখ দুটো ধক করে জ্বলে উঠল, ‘‘কারণ কাউরীবুড়ি কোনো আনন্দ বা উল্লাসের শব্দ সহ্য করতে পারেন না। তাই তাঁর এলাকায় সমস্ত অবাঞ্ছিত শব্দের প্রবেশ নিষেধ, কোনো অবাঞ্ছিত অতিথির প্রবেশও নিষেধ।’’

অস্ফুটে বলে ফেললাম, ‘‘সেইজন্যই ওই গোলকপুষ্পের কথা কেউ জানে না...!’’

পথ চলতে চলতে থমকে দাঁড়ালেন তিনি, তারপর ডান হাতের তর্জনী তুলে শাসাবার ভঙ্গিতে বললেন, ‘‘এই শেষবারের মতো আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি ওই ফুলের কথা ভুলেও উচ্চারণ করবেন না। ও ফুল মহা পবিত্র ফুল, অম্বুবাচীর দিন কাউরীবুড়ির কাছে ওকে অর্ঘ্য দেওয়া হয়। ওকে এখান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার কথা ভুলেও ভাববেন না। আপনার মহাসর্বনাশ হবে।’’

বলে থামলেন একটু। তারপর বললেন, ‘‘অবশ্য তুলে নিয়ে গিয়েও লাভও নেই। ওই মন্দির ছাড়া এই লতা আর অন্য কোথাও বাঁচবেও না।’’

বেকুবের মতো প্রশ্ন করলাম, ‘‘কেন?’’

ভদ্রমহিলা ঘুরে দাঁড়ালেন।

রাস্তা শেষ হয়ে আসছিল। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকে একটু বাঁদিকে জঙ্গলের বড় রাস্তাটা দেখা যাচ্ছিল, যেটা ধরে আমি এসেছিলাম। সেদিকে তর্জনী তুলে আমাকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন ভদ্রমহিলা। নিজে ডানদিকের একটা সুঁড়িপথ ধরে চলে যাচ্ছিলেন। কী একটা ভেবে থমকালেন, তারপর ঘনিয়ে আসা অন্ধকার আরও গাঢ় করে দিয়ে বললেন, ‘‘কারণ কাউরীবুড়ির কাছে দেওয়া বলির রক্ত ছাড়া ও লতা বাঁচে না।’’

* * * *

সেদিন ফিরতে ফিরতে সন্ধে সাতটা বেজে গেছিল। তখন ওদিককার শহরগুলোতে ছটা বাজলেই রাত। তার ওপর ছিঁচকে চোর বা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উৎপাত তো আছেই। একে অচেনা জঙ্গল, তার ওপর সন্ধের অন্ধকার। স্রেফ একটা টর্চের ভরসায় সাপখোপের কামড় এড়িয়ে সেদিন যে কী করে ফিরেছি সে গল্প না হয় আরেকদিন বলব।

বাড়িতে ঢোকার আগে একটু দূর থেকেই দেখতে পেলাম সদর দরজায় আলো জ্বলছে, সেখানে বেশ কয়েকজন জটলা করে। কাকু-কাকিমা তো আছেনই, এমনকি কাকুদের প্রতিবেশী দু-তিনজনকেও চিনতে পারলাম। একটু এগোতে দেখি মংকুও সেখানে উপস্থিত। প্রমাদ গণলাম, ব্যাটা কী বলতে কী বলেছে কে জানে?

বাড়িতে ঢুকতেই কাকু দৌড়ে এলেন, ‘‘এ কী ভবতারণ, এত রাত অবধি ছিলে কোথায়? আমি আর তোমার কাকিমা তো ভেবে ভেবে সারা। তার ওপর মংকু বলল আজ নাকি ওকে আসতে বারণ করে দিয়েছ? কোনো আপদ-বিপদ হয়নি তো? আমি তো আরেকটু হলেই থানায় যাচ্ছিলাম।’’

কাষ্ঠহাসি হেসে বললাম, ‘‘আরে না না কাকু, চিন্তা করার মতো তেমন কিছুই হয়নি। ঘুরতে ঘুরতে একটু শহরের বাইরে চলে গেসলাম। তারপর গাড়ি-ঘোড়া না পেয়ে হেঁটে আসতে একটু দেরি হল, এই যা!’’

কাকিমা ছলছল চোখে বললেন, ‘‘অমন করতে আছে বাছা? পরের ছেলে বলে কি আমাদের চিন্তা হয় না? ভালোমন্দ কিছু যদি একটা ঘটে যেত?’’

আমি আমার মাকে হারিয়েছি সেই কোন ছোটবেলায়, তাঁর কথা ভালো করে মনেও পড়ে না। স্মৃতি বলতে একটা পুরোনো হাতে বোনা সোয়েটার আর কিছু রংচটা ফটোগ্রাফ। কাকিমার ছলছল চোখদুটি দেখে আমার মরে যাওয়া মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। আজ যদি আমার নিজের মা বেঁচে থাকতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তিনিও এইভাবেই আমার চিন্তায় কাতর হতেন, এইভাবেই আমার পথ চেয়ে থাকতেন?

মনস্থির গতকালই করে নিয়েছিলাম, আজ আরও দৃঢ়সংকল্প হলাম। এই মায়ের মুখে হাসি ফুটিয়ে তবেই আমি ফিরব।

কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে হাত-পা ধুয়ে নিতে নিতে মংকুকে চাপা গলায় বললাম, ''খুলে বল তো, কী বলেছিস কাকুকে?''

জল ঢালতে ঢালতে মংকু একবার ঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে দেখে নিল। তারপর বলল, ''বাবুকে তেমন কিছুই বলিনি। শুধু বলেছি দাদা আজকে আমাকে আসতে বারণ করে দিয়েছে, বলেছে শহরটা একা একা ঘুরে দেখতে চায়।''

''সাবাস!'' বলে গামছাটা হাতে টেনে নিলাম, ''কাল সকালে তোর সঙ্গে আমার আলাদা করে কথা আছে।''

''কী নিয়ে?''

''কাউরীবুড়ির মন্দির নিয়ে।''

''কেন?'' কুয়োর বালতিটা হাতে নিয়েই উঠে দাঁড়াল মংকু। ওর স্বরে ফের সেই ভয়ের ছায়া।

''আজ আমি কাউরীবুড়ির মন্দিরে গেছিলাম।''

মংকুর হাত থেকে বালতিটা সশব্দে পড়ে গিয়ে বিশ্রী একটা খ্যানখ্যানে আওয়াজ তুলল। আমি ধরে না ফেললে ছোকরা পড়েই যেত হয়তো। অতি কষ্টে ওর মুখটা চেপে ধরে আস্তে করে শুইয়ে দিলাম কুয়োতলায়। বাড়ির ভেতর থেকে কাকু চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ''কী হল রে মংকু, আওয়াজ কীসের?'' আমি চেঁচিয়ে বললাম, ''ও কিছু না কাকু, বালতিটা হাত থেকে পড়ে গেসল।''

মুখে কিছুক্ষণ জলের ঝাপটা দিতেই পিটপিট করে চাইল ছোকরা, তারপর আমার হাত ধরে ধীরে ধীরে উঠে বসল। দাঁড় করাতে গিয়ে দেখি পা থরথর করে কাঁপছে ছেলেটার।

থিতু হতে একটু সময় নিল মংকু। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, আমি ফের মুখে হাত চাপা দিয়ে বললাম, ''আস্তে, এখন না। কাল সকাল দশটা নাগাদ করোনেশনের সামনে। সেখানেই কথা বলব। এখন বাড়ি যা।''

* * * *

''আপনি ডেকেছিলেন?''

ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলাম মাধুরী। পরনে একটা অফ হোয়াইট শাড়ি। সম্পূর্ণ নিরাভরণ বেশ, হাতে শাঁখা-নোয়া কিছুই নেই, গলাও খালি। সদ্যবিবাহিত কোনো মেয়ের পক্ষে যেটা একটু অস্বাভাবিক। অলংকার বলতে শুধু ডান হাতের আঙুলে দুটো আংটি। তবে হ্যাঁ, সিঁথিতে ডগডগ করছে লাল টকটকে সিঁদুর। সধবার চিহ্ন বলতে ওইটুকুই।

সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিলাম। বললাম, ''বোসো।''

ধীর পায়ে এসে চেয়ারে বসল মাধুরী। তারপর শান্তস্বরে বলল, ''বলুন। ডেকেছেন কেন?''

কিছু বলার আগে একটা হালকা গন্ধ আমার নাকে এল, কিছু একটা পোড়ার গন্ধ। ভিজে কাঠ জ্বলতে থাকলে যেমন একটা ভ্যাপসা ধোঁয়ার গন্ধ ছড়িয়ে থাকে, সেরকম। গন্ধটা একটু অস্বস্তিকর। কিন্তু সেসবে আমল দিলাম না।

বাজে কথায় সময় নষ্ট না করে সরাসরি প্রসঙ্গে এলাম, ''তোমার ব্যাপারে শুনলাম। কাকু-কাকিমা কাল সবই বলেছেন আমাকে। আমি কি এ ব্যাপারে কোনোভাবে তোমাকে হেল্প করতে পারি?''

''না।'' সংক্ষিপ্ত এবং দৃঢ় উত্তর। বুঝলাম এভাবে হবে না। অন্য রাস্তা ধরতে হবে।

''তুমি জানো বোধহয়, আমি বহুদিন যাবৎ আয়ুর্বেদ নিয়ে চর্চা করি। সেই সূত্রে নানাধরনের ভেষজ ওষুধ জানা আছে আমার। যদি তোমার বা অনির্বাণের কোনো ইয়ে, মানে শারীরিক সমস্যা থাকে তো আমাকে সেটা নির্দ্বিধায় বলতে পারো। আমি এরকম অনেক কেস সলভ করেছি।''

''না, তার দরকার নেই।'' মনে হল একটু বিরক্ত হয়েছে মেয়েটা।

প্রমাদ গুনলাম। মনে হচ্ছে ভুল লাইনে খেলে চটিয়ে দিয়েছি মেয়েটাকে। পেশেন্ট যদি একবার বিগড়ে যায় তো মুশকিল। তাকে দিয়ে তখন আর কিছুই বলানো যাবে না।

''হুম। আচ্ছা, অন্য কথা বলা যাক। অবসর সময়ে তুমি কী করো মাধুরী?''

''গান শুনি। সিনেমা দেখি। বই পড়ি।''

''গাইতে পারো?''

''পারি।''

''একটা গেয়ে শোনাবে?''

''না।'' আবার সেই পাথুরে দেওয়াল।

এবার সত্যিই মাথা চুলকোতে লাগলাম। আমি মনস্তত্ত্ববিদ নই। এসব ক্ষেত্রে কী করে মনের দরজা খুলে রোগীর হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করতে হয় সে আমার অজানা। এখন কী উপায়?

''আপনি আয়ুর্বেদচর্চা করেন বললেন তো। আর কিছু পারেন?'' আমার চিন্তাজালকে ছিন্ন করে বলে উঠল মাধুরী।

''আর কিছু বলতে?''

''হাত দেখতে বা কোষ্ঠীবিচার করতে পারেন?''

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন। মাধুরী নিজে থেকেই আমার কোর্টে একটা সহজ বল ঠেলে দিয়েছে।

''পারি বই কি!'' আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠলাম, ''প্রায় দশ বছর হল এই নিয়ে চর্চা করছি, পারব না মানে? খুব ভালোভাবেই পারি।''

''ভবিষ্যৎ বলতে পারেন?''

''আলবাত। কী জানতে চাও বলো?''

মাধুরী ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। তারপর প্রাণহীন শুকনো স্বরে বলল, ''দেখুন তো, আমি মরে যাব কবে।''

এইবার সোজা হয়ে বসে মেয়েটার দিকে চাইলাম। একটা দিশা দেখতে পাচ্ছি মনে হচ্ছে!

আমি হাত দেখতে পারি জেনে অনেক বয়স্ক বা প্রৌঢ় লোককে দেখেছি আমার হাতে তাঁদের হাত তুলে দিতে। তাঁরা খেলাচ্ছলে জিজ্ঞেস করেন, ''ভালো করে দেখে বলো তো বাছা, এই ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাব কবে?'' বোঝাই যায় তাঁরা মরতে চাওয়ার মুহূর্তটির খোঁজ নয়, বরঞ্চ আর ক'দিন বেঁচে থাকতে পারবেন তার হিসেব চান। আমিও তাই প্রতিটি ক্ষেত্রে হাসিমুখে বলি, ''আরে আপনি এখনও অনেকদিন বাঁচবেন মাসিমা। আগে নাতির ঘরে পুতির মুখ দেখুন। তারপর নাহয় পরপারে যাওয়ার কথা ভাববেন। এখনই তাড়া কীসের?'' তাঁরাও মনোমতো উত্তর পেয়ে হাসিমুখে আশীর্বাদ করে চলে গেছেন।

কিন্তু মাধুরীর বলার মধ্যে একটা রিক্ত আকুতি ছিল, একটা নিঃশেষ ফুরিয়ে যাওয়া ছিল, মৃত্যুর দিকে অলস বয়ে যাওয়া ছিল। ওর প্রতিটি স্বরে ফুটে উঠছিল এক নির্মম অমোঘ সত্য, ওপারের চিঠির খোঁজে উদগ্রীব এই মেয়ে। আর সেই তিক্ত উদাসীন শূন্য আকুতির সঙ্গে একটা জায়গারই তুলনা চলে।

শ্মশান।

কথাটা ভাবতে ভাবতেই ফের সেই গন্ধটা আমার নাকে এল। ভিজে কাঠ পোড়ার গন্ধ। ভ্যাপসা, শ্বাসরুদ্ধকর একটা গন্ধ।

হাতটা তুলে আমার দু'হাতের মধ্যে নিলাম। আগেই বলেছি, এই শাস্ত্রে আমার কিছু ব্যুৎপত্তি আছে। হাওড়া শালকিয়ার বিখ্যাত জ্যোতিষাচার্য আশুতোষ ন্যায়রত্ন নিজের হাতে আমাকে এই শাস্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন। তাঁর শিক্ষা ব্যর্থ হতে পারে না।

নরম হাত, আঙুলগুলি চাঁপাকলির মতো। নখগুলি সুন্দর ও গোলাকার আকারের। এ মেয়ে স্পষ্টতই বৃহস্পতির জাতিকা। কিন্তু সেই সঙ্গে এও লক্ষ করলাম যে সমস্ত হাত জুড়ে একটা কালো ছোপ পড়েছে।

চামড়াগুলো শুকনো, খসখসে। নখের ডগাগুলো নিষ্প্রাণ এবং ফ্যাকাশে। দেখে মনে হল চাঁদের গায়ে যক্ষ্মার গ্রহণ লেগেছে।

হাতের তেলোটা দেখেই চমকে উঠলাম। এ যে অতি উঁচু দরের আধ্যাত্মিক হাত! লাখে একটা মেলে! বৃহস্পতির স্থান অতি উচ্চ, সেখানে একটি রিং চিহ্ন বর্তমান। সেইসঙ্গে শনির স্থানও উচ্চ এবং সেখানে একটি ত্রিশূলচিহ্ন স্পষ্ট। তার ওপর কেতুর স্থান থেকে বৃহস্পতি অবধি একটি রেখা প্রসারিত। অত্যন্ত উচ্চকোটির ঐশী অনুগ্রহপ্রাপ্ত মানুষ না হলে এই তিনটি চিহ্ন থাকে না। এও বুঝতে পারছিলাম যে জাতিকার জীবনে অন্তত এমন একটি ঘটনা ঘটবে যার দ্বারা তিনি ঈশ্বরের কাছাকাছি পৌঁছোবেন! কিন্তু সেটা যে কী তা হাত দেখে বোঝা দুষ্কর।

কিন্তু আমার চোখে ধরা পড়ে গেছিল একটা খুব অদ্ভুত জিনিস। জাতিকার বাইশ বছর বয়সে একটা প্রায় একইসঙ্গে মৃত্যুযোগ এবং বৈধব্যযোগ আছে। যদি উনি এই ফাঁড়াটা কাটিয়ে ওঠেন, তাহলে আমার গণনা আরও বলছে যে উনি কম করে আরও তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর অবধি সুখে বাঁচবেন। কিন্তু যে ফাঁড়া আছে তার থেকে মুক্তি পাওয়া প্রায় অসম্ভব!

দুটো কথাই বললাম ওকে। শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল মাধুরী। তারপর মুখ তুলে বলল, ‘‘আমার ভগবান চাই না দাদা, ভগবানের আশীর্বাদও চাই না। এই জীবনে আমি শুধু একটা জিনিসই চাই, অনির্বাণ চৌধুরীকে ফিরে পেতে। ওকে ছাড়া আমার এই জীবনে আর কিছুই চাইবার নেই। আমার দিকে তাকিয়ে সত্যি করে বলুন তো, আমি কি ওকে আর কোনোদিনই ফিরে পাব না?’’

তাকিয়ে দেখি মাধুরীর পদ্মদিঘি চোখে টলটল করছে মুক্তোর মতো দু’ফোঁটা জল। চেপে রাখা কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠছে ওর শরীর। একটু আগের সেই নিস্পৃহ উদাসীনতা, শুষ্ক কাঠিন্য আর নেই, তার জায়গা নিয়েছে এক প্রবল, অব্যক্ত আকুতি। যেন গাঢ় অভিমানের সুউচ্চ বাঁধ ভেঙে উছলে উঠেছে আবেগের প্রবল বর্ষণধারা, ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে ওর হৃদয়ের তপ্ত এবং আকুল জনপদ।

আমি চুপ করে রইলাম। কিছুক্ষণ পর মাধুরী নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ‘‘আমি আজ আর কিছু বলার অবস্থায় নেই দাদা। নিজেকে একটু গুছিয়ে নিতে দিন প্লিজ। আমি কথা দিচ্ছি, কাল আমি আপনাকে সব বলব। এবার আমিও একটা এসপার বা ওসপার চাইছি।’’

পরের দিন মুখ খুলেছিল মাধুরী। আমাকে জানিয়েছিল কী ঘটেছে ওর সঙ্গে। তারপর সেখান থেকে যেটা শুরু হল সেটা আটকাবার ক্ষমতা আমার নিজেরও ছিল না।

* * * *

পরের দিন সকালে মংকুর সঙ্গে দেখা হল তিনসুকিয়ার ফেমাস সিনেমা হল করোনেশনের সামনে। জায়গাটা জিএনবি রোডের ওপর, খুবই জনবহুল রাস্তা। রিকশা, টেম্পো, আর গাড়িঘোড়ার আওয়াজে কান পাতা দায়। সেখানে একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পান খাচ্ছি, আর ভাবছি মনুষ্যচরিত্র কত জটিল, এমন সময় ডানদিকের কাঁধে একটা টোকা পেয়ে দেখি মংকু। তবে ও একা নয়, সঙ্গে আরেকজন।

লোকটা যে মংকুরই জাতভাই সেটা আর বলে দিতে হয় না। মঙ্গোলীয় চোখমুখ, গাঁট্টাগোঁট্টা শরীর, হাইট সাড়ে পাঁচ ফুটের বেশি হবে না। পোশাকে-আশাকে বোঝা যায় মোটামুটি পয়সাওয়ালা লোক। কিন্তু ছটফটে চোখ আর ছোট করে কাটা কদমছাঁট চুলে একটা সতর্ক ও ধূর্ত মানুষের অবয়ব স্পষ্ট।

লোকটাকে দেখে আমি অবাকই হয়েছিলাম। মংকুকে আমি এখানে আসতে বলেছিলাম বটে, কিন্তু সঙ্গে অন্য কাউকে আনতে তো বলিনি? এ আবার কোন উটকো আপদ?

মংকুই আমাকে ইশারা করে বলল সাইডে আসতে। পান দোকানটার পেছনে একটা বটগাছের নীচে নির্জন জায়গায় দাঁড়ালাম আমরা তিনজন। মংকুর সঙ্গে আসা লোকটা একটা বিড়ি ধরাল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বিড়ির প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বলল, ‘‘চলে?’’

বিড়ি-সিগারেট ছেড়েছি প্রায় বছর পাঁচেক। তবুও সম্পর্ক তৈরির খাতিরে একটা বিড়ি টেনে নিলাম। আর তারপর মংকুর এগিয়ে দেওয়া আগুনে বিড়িটা জ্বালিয়ে একটা টান দিয়েই বুঝলাম যে মস্ত বড় ভুল করেছি। এই কড়া তামাকের ধক সহ্য করার ক্ষমতা আমার কলজের নেই।

''আমার নাম পরাগ বসুমাতারি। এখানকার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সরকারি গাইড।'' বিড়িতে একটা লম্বা টান মেরে বলল লোকটা। তারপর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সরু চাউনিতে আমার দিকে চেয়ে বলল, ''মংকু আমাকে বলল, আপনি নাকি কাল কাউরীবুড়ির মন্দিরে গেছিলেন?''

কথাটা মংকু আর আমার মধ্যে থাকার কথা। ব্যাটা সেটা চাউর করে দিয়েছে বলে ওর দিকে একটা কড়া চাউনি দিলাম।

লোকটা ভকভক করে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, ''মংকু কথাটা আমাকে বলেছে বলে ওর ওপর খাপ্পা হওয়ার কোনো দরকার নেই সাহেব। সম্পর্কে ও আমার জ্ঞাতিভাই হয়, তার ওপর জিগরি দোস্তও বটে। ব্যাটা কোনো কথাই আমার কাছে লুকোয় না। আপনি কবে এসেছেন, কেন এসেছেন, জঙ্গলে গিয়ে কী করেন, মানে মোটমাট আপনার ব্যাপারে সবই আমার জানা। পরশু আপনি মাগুরি বিলের পাশে একটা রেয়ার সাদাপেট হেরনের ছবি তুলতে গিয়ে সাপের কামড় খেতে খেতে বেঁচে গেছেন, ঠিক কি না?''

কথাটা নির্জলা সত্যি। ইচ্ছে করছিল মংকুর কানের গোড়ায় গুছিয়ে একটা থাপ্পড় কষাই। শালা মিরজাফর! শুয়োরের বাচ্চাটা সব কথা উগরে দিয়েছে এর কাছে।

''ফলে কাল আপনি কাউরীবুড়ির মন্দিরে গেছিলেন, এইরকম একটা ইম্পর্ট্যান্ট কথা আমার কাছে ও লুকোবে সেটা তো হতে পারে না।''

হাতে ধরা বিড়িটায় সন্তর্পণে আরেকটা টান দিয়ে বললাম, ''হুঁ, গেছিলাম। তো?''

লোকটার চাউনি একটু কড়া হয়ে উঠল, ''তার প্রমাণ দিতে পারেন?''

এবার আমার অবাক হওয়ার পালা। কেন রে ভাই, আমি কোথায় কোন মন্দিরে গেছিলাম তার প্রমাণ তোকে কেন দিতে যাব? তুই লোকটা প্রমাণ চাওয়ারই বা কে?

আমার প্রশ্নটা শুনে পরাগ থমকাল খানিক। তারপর হাতের বিড়িটা মাটিতে ফেলে চটি পরা পা দিয়ে পিষতে পিষতে বলল, ''কারণ আমার মনে হয় আপনি মিথ্যে বলছেন।''

আমিও বিড়িটা ফেলে বুটের ডগা দিয়ে পিষে দিয়ে বললাম, ''তাতে আমার ছেঁড়া যায়।''

কুতকুতে চোখ দুটো মেলে আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল পরাগ বসুমাতারি। বোধহয় আমার মনের কথাটা আঁচ করতে পারল। সুরটা সামান্য নরম করে বলল, ''রাগ করবেন না দাদা। আপনি যদি কাউরীবুড়ির মন্দিরের ব্যাপারে আপনার মতলবটা একটু খুলে বলেন, তাহলে হয়তো আপনার কাজে লাগলেও লাগতে পারি।''

''সে তো বুঝলাম। কিন্তু আমার কাজে লেগে আপনার স্বার্থ?'' সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম।

''স্বার্থ আছে বই কি। নইলে আর এখানে ছুটে আসব কেন?''

''কী চাই? টাকা?'' আদানপ্রদানের জায়গাটা প্রথমেই খোলসা হয়ে যাওয়া ভালো।

টাকার কথা শুনে লোকটা থমকাল খানিক। ফের সেই কুতকুতে চোখে চেয়ে রইল আমার দিকে। তারপর গলাটা একটু খাঁকারি দিয়ে বলল, ''টাকার ব্যাপারটা তো আছেই। তা ছাড়াও অন্য আরেকটা কারণও আছে।''

''কী সেটা?''

লোকটা আরেকটা বিড়ি ধরাল। একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল ওকে। বিড়িতে একটা লম্বা টান মেরে খানিকটা আত্মমগ্ন ভাবে বলল, ''সেটা বলার আগে এই কাউরীবুড়ির মন্দির নিয়ে একটু ভেঙে বলতে হয় যে!''

পাশে একটা ভাঙাচোরা বেঞ্চি পাতা ছিল। সেখানে বেশ জুত করে বসলাম। তারপর মনের ভাব লুকিয়ে একটু হেসে পরাগকে বললাম, ''এসব কথা কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হয় ভায়া? এসো, এখানে বসো তো। চা খাবে?'' মনে হল আপনি-র বদলে তুমি বললে হয়তো ব্যাপারটা আরও সহজে ম্যানেজ করা যাবে।

সামনে দিয়ে মস্ত বড় কেটলি হাতে এক চাওয়ালা যাচ্ছিল। তাকে পাকড়াও করে তিন কাপ চা কেনা হল। একটা বড় ভাঁড়ে চা নিয়ে শ্রীমান মংকুকুমার উলটোদিকে পড়ে থাকা একটা বড় পাথরের ওপর অধিষ্ঠিত হলেন।

চায়ের ভাঁড়টা হাতে নিল পরাগ, দু'হাতে চেপে ধরে খানিকটা ওম নিল। তারপর একটা লম্বা চুমুক দিয়ে বলল, ''আপনি কাউরীবুড়ির মন্দিরে গেছিলেন শুনেই আমি কেন দৌড়ে এসেছি সেটা কি বুঝতে পারছেন?''

নেতিবাচক মাথা নাড়লাম। এখনও অবধি কিছুই বুঝিনি।

''এই মন্দির আমাদের, মানে দেওরিদের কাছে একটা রহস্যবিশেষ বুঝলেন? আমাদের সমাজের বাইরে কেউ এর নাম জানে না। দেওরিদের মধ্যেও যারা জানে তাদের সংখ্যাও এক হাতেই গোনা যায়। তবে তারাও এর নামই শুনেছে, কেউ দেখেনি। আমরা বিশ্বাস করি যে কাউরীবুড়ির থানে যে যায়, সে আর বেঁচে ফেরে না।''

বেঁচে না ফেরার ব্যাপারটা কালকের সেই ভদ্রমহিলাও বলছিলেন বটে। আর দেওরি নামে যে এখানে একটা ট্রাইব আছে সেটা আগেই জানতাম। কিন্তু দেওরিদের সঙ্গে এই কাউরীবুড়ির মন্দিরের কী সম্পর্ক?

চায়ের ভাঁড়ে একটা চুমুক দিয়ে বললাম, ''কেসটা কী খুলে বলো তো ভায়া। আমি তো কিছুই বুঝছি না। কে এই কাউরীবুড়ি? তাঁর মন্দিরে যাওয়া নিয়ে এত বিধিনিষেধ কীসের? আর সেখানে কেউ গেলে বেঁচে ফেরে নাই বা কেন?''

আমার দিকে আড়চোখে তাকাল পরাগ। এতক্ষণে ওর আত্মভোলা ভাবটা কেটে গিয়ে সেই ধূর্ত ভাবটা ফিরে আসছিল। মিচকে হেসে বলল, ''দেখুন, এসব হচ্ছে গিয়ে আমাদের জাতের গোপন কথা। এসব কথা এদিক-ওদিক বলে বেড়ানো আমাদের জন্য একেবারে নিষেধ, বুঝলেন?''

বুঝলাম। গাড়ি লাইনে আসছে, না বুঝে উপায় কী?

''একে আপনি বাইরের লোক, তার ওপর কাউরীবুড়ির মন্দিরেও গিয়ে একটা মস্ত বড় অপরাধ করে বসে আছেন। তার ওপর আপনার যে কী মতিগতি সেসব কিছুই জানি না। আপনাকে এতসব বলাটা কি ঠিক হবে?''

বুঝলাম, মংকু দেখে দেখে ঠিক লোককেই এনেছে আমার কাছে। পকেট থেকে দুটো একশো টাকার নোট বার করে লোকটার জামার বুকপকেটে গুঁজে দিলাম।

তাতে কাজ হল। শ্রীমান পরাগ বসুমাতারি তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী বিতরণ শুরু করলেন।

''আমরা দেওরিরা হচ্ছি এই উজনি আসামের অনেক পুরোনো জনজাতি। দেওরি কথাটা এসেছে দেব বা দেও থেকে। এককালে ঈশ্বরভক্ত জাতি হিসেবে পুরো অহোমে আমাদের বিপুল খ্যাতি ছিল। দেবী কেশাইখাতি-র নাম শুনেছেন তো?''

মাথা নেড়ে জানালাম যে শুনেছি তো বটেই। ভারতবর্ষে পূজিত সবচেয়ে ভয়ংকরী দেবীদের মধ্যে ইনি অন্যতমা। সুটিয়া রাজত্বের সময় নিত্য নরবলি হত দেবী কেশাইখাতি-র মন্দিরে। সেই থেকে দেবীর নাম কেশাইখাতি বা কেচাইখাতি। অর্থাৎ যে দেবী কাঁচা খান!

''কাউরীবুড়ি হচ্ছেন কেশাইখাতি-র মতোই আমাদের এক অত্যন্ত ভয়ংকর দেবী।

এঁর ব্যাপারে বিশদে বলার আগে আমাদের দেওরিদের আরেকটা ব্যাপার বলে রাখা ভালো। সেটা হচ্ছে যে আমাদের মধ্যে তিনটি প্রধান উপজাতি বা গোষ্ঠী আছে। তাদের নাম হচ্ছে দিবংগোঁয়্যা, বড়গোঁয়্যা আর তেঙাপোনিয়া।''

এই তিনটে নাম রিসেন্টলি কোথায় শুনেছি না? স্মৃতির মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে হঠাৎ করে বিদ্যুৎচমকের মতো মনে পড়ে গেল। মংকুই বলেছিল বটে!

''কিন্তু এককালে এই তিনটে ছাড়াও আমাদের দেওরিদের আরও একটি উপজাতি ছিল।''

''তাই নাকি? কী নাম তাদের?''

''পাতরগোঁয়্যা।''

''ভেরি ইন্টারেস্টিং তো। তা ছিল বলছ কেন?''

''কারণ এখন আর তারা নেই বলে।''

পৃথিবীর ইতিহাসে বিলুপ্তির অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া জনজাতির উদাহরণ বিরল নয়। ফলে তাতে বিশেষ আমল দিলাম না।

''হুম। তা এই পাতরগোঁয়্যা না কী একটা বললে, তাদের আজ কোনো চিহ্ন নেই কেন?''

''সে এক খুব পুরোনো গল্প।'' বেঞ্চিতে পা দুটো তুলে বেশ জুত করে বসল পরাগ, ''আর সেটাই আপনাকে বিশদে বলার।

আমাদের কিংবদন্তি অনুযায়ী, আজ থেকে আড়াইশো বছর আগে পাতরগোঁয়্যাদের বড়দেওরি নাকি ওদের দেবীর পুজোয় খুব বড়সড় একটা ভুল করে। তখন দেবী কঠিন অভিশাপ দেন যে একমাত্র বড়দেওরির পরিবার ছাড়া এই গোষ্ঠীর সবাই সবংশে নিহত হবে। আর বড়দেওরির বংশের সবাইকে বংশানুক্রমে অনন্তকাল ধরে দেবীর পুজো করে যেতে হবে।''

''ইন্টারেস্টিং! কী এমন অপরাধ শুনি?''

''সেটা কেউ জানতে পারেনি। তবে সাংঘাতিক কিছু হবে। নইলে এত বড় অভিশাপ কেউ দেয়? দেবদেবীর পুজোয় ছোটখাটো কত ধরনের খুঁতই তো হয়ে থাকে।''

''হুম। তা পাতরগোঁয়্যাদের সেই দেবীই কি কাউরীবুড়ি?''

মাথা ঝুঁকিয়ে হ্যাঁ বলে পরাগ।

''হুম। তারপর?''

''তারপর আবার কী। একদিনের মধ্যে পাতরগোঁয়্যারা দেবীর রোষে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।''

কথাটা শুনে থমকে গেলাম। লোকটা বলছেটা কী? একটা গোটা উপজাতি একদিনের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল? তাও কোনো এক পাথুরে মূর্তির অভিশাপে? এরকম হয় নাকি?

''কীভাবে নিশ্চিহ্ন হল শুনি? যুদ্ধ-টুদ্ধ লেগে? ঝড়-ঝঞ্ঝা? অথবা আগুন? নাকি বন্যা?''

এইবার প্রথমবার একটু অস্বস্তি দেখলাম পরাগের মুখে। একটু ইতস্তত করে বলল, ''সেটা ভারী অদ্ভুত কাহিনি দাদা। আমাদের দেওরিদের মধ্যে বংশপরম্পরায় এই কাহিনি চলে আসছে। এটা শুনলে বুঝবেন কেন কেউ কাউরীবুড়ির মন্দিরে যাওয়ার সাহস করে না।

আজকাল আমাদের দেখে বিন্দুমাত্র বোঝার উপায় নেই যে কে দিবংগোঁয়্যা আর কেই বা তেঙাপোনিয়া। সবাই মিলেমিশে গেছে। কিন্তু অনেক আগে সেটা বোঝা যেত। তখন চারটে গোষ্ঠী আলাদা আলাদা গ্রামে থাকত। এক গোষ্ঠীর লোকজনের পক্ষে অন্য গোষ্ঠীর গ্রামে ইচ্ছেমতো ঢোকা-বেরোনোর ওপর একটা অলিখিত কড়াকড়ির ব্যাপার ছিল।''

''তা তোমাদের এই গ্রামগুলো ছিল কোথায়?''

''এই এখানেই। সদিয়া আর তিনসুকিয়া মিলিয়ে। যেমন ধরুন আমি জাতিতে দিবংগোঁয়্যা। আমাদের আদি গ্রাম ছিল ডুমডুমা বলে একটা জায়গায়। এখান থেকে আধঘণ্টার রাস্তা।''

''আর পাতরগোঁয়্যাদের?''

''পাতরগোঁয়্যাদের গ্রামটা ছিল অন্যদের থেকে একটু দূরে, মাগুরি বিলের ধারে। জঙ্গলের মধ্যে যে শুখানালাটা আপনি দেখেছিলেন, তার ওপারে।

পাতরগোঁয়্যারা চিরকালই অন্যদের থেকে একটু তফাতে থাকতে পছন্দ করত, সবার সঙ্গে চট করে মিশত-টিশত না। ওদের আচার-আচরণ, বেশভূষা, এসবও ছিল অন্যদের থেকে বেশ খানিকটা আলাদা।''

''তাতে বাকিরা, মানে অন্য তিন জাতের লোকজন ওদের নিয়ে কিছু বলত না?''

''প্রশ্নই ওঠে না! ঘাঁটানো তো দূরে, বাকিরা বরং ওদের একটু ভয়ই পেত।''

''কেন? ভয় পেত কেন?''

''তার দুটো কারণ। আপনি তো জানেনই, আমরা এমনিতে পুজো-আচ্চা, ঝাড়ফুঁক, এসবে খুবই বিশ্বাস করি। আমাদের বড়দেওরিরাও প্রত্যেকেই তুকতাক ইত্যাদিতে খুব পারদর্শী। কিন্তু পাতরগোঁয়্যাদের তুকতাক বা তন্তরমন্তর ছিল বাকিদের থেকে অনেক উঁচু দরের। সাধারণ বিষকাটান, বাটিচালা, ধুলাপড়া, বাণমারা এসব ছোটখাটো বিদ্যা তো ছেড়েই দিন। বিভিন্ন ঘরোয়া অশান্তির উপশম, সাপে কাটার ওষুধ, বিভিন্ন জটিল মেয়েলি রোগের চিকিৎসা, এসবেও এদের খ্যাতি ছিল সাংঘাতিক। আর মারণবিদ্যায় তো কথাই নেই। যদি পাতরগোঁয়্যাদের কেউ অন্য জাতের কারও ওপর রুষ্ট হত, তবে আমরা ধরেই নিতাম যে সে আর বেশিদিন বেঁচে নেই।''

''এটা তো হল গিয়ে প্রথম কারণ। তবে দ্বিতীয়টা?''

''বলছি সাহেব। সেটাই হচ্ছে আসল।''

''কী সেটা?'' প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে আড়চোখে দেখলাম মংকুও উৎকর্ণ হয়ে শুনছে।

একটু সময় নিল পরাগ। চোখ কুঁচকে কী যেন একটা ভাবছিল ও। তারপর বলল, ''এককালে আমাদের মধ্যে নরবলির প্রচলন ছিল জানেন তো?''

''জানি। সুটিয়া রাজাদের রাজত্বের সময় দেবী কেচাইখাতির কাছে রেগুলার নরবলি হত। বলির মানুষ সাপ্লাই আসত মৃত্যুদণ্ড পাওয়া আসামিদের মধ্যে থেকে বা যুদ্ধে হারিয়ে দেওয়া অন্য উপজাতির লোকদের থেকে। কি, ঠিক বলেছি তো?''

''হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। শুধু জেনে রাখুন যে সেই বলি দেওয়ার অধিকার ছিল একমাত্র পাতরগোঁয়্যাদের। আর কারও নয়।''

চুপ করে রইলাম। এই তথ্যটা জানা ছিল না।

''আমাদের প্রচলিত উপকথা অনুযায়ী, সেইজন্য পাতরগোঁয়্যারা অন্য জাতের লোকজনকে একটু নীচু নজরে দেখত। অন্য জাতের লোকেরাও নাকি পাতরগোঁয়্যাদের গ্রামে বিশেষ একটা যেত-টেত না। গেলেও চেষ্টা করত বেলা থাকতে থাকতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজের গ্রামে ফিরে আসা যায়।''

ব্যাপারটা উত্তরোত্তর জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। এসব উপজাতিদের মধ্যে অনেক গল্পগাছা, কিংবদন্তি, লোককাহিনি ইত্যাদি প্রচলিত আছে জানি। কিন্তু এটা তাদের মধ্যে একেবারে অন্যরকম।

''তবে আরও একটা ব্যাপারে ওরা আমাদের থেকে একদম আলাদা ছিল।''

''যেমন?''

''বড়দেওরি মানে পুরুষ, চিরকাল আমরা এই দেখে এসেছি। কিন্তু ওদের সমাজ চালাত মেয়েরা। মেয়েরাই ওদের বড়দেওরি হতেন। একজন বড়দেওরি মরে গেলে তাঁর বড় মেয়ে পরের বড়দেওরি হতেন, এইভাবে চলত।''

শোনামাত্র নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল আমার। কালকেই এই কথাটা শুনেছি না? কিন্তু সেটা ওকে বুঝতে দিলাম না।

''সে তো বুঝলাম। কিন্তু তুমি আসল গল্পটাই বললে না যে। পাতরগোঁয়্যারা সবাই একদিনের মধ্যে উধাও হয়ে গেল কী করে?''

ফের খানিকক্ষণ চুপ করে রইল পরাগ। তারপর গলা নামিয়ে ধীরে ধীরে বলল, ''ওদের দেবী যে রুষ্ট হয়ে খুব সাংঘাতিক একটা অভিশাপ দিয়েছেন সে খবর আমরা অন্যভাবে পেয়েছিলাম বটে। কিন্তু সেই

রাতে কেউ আর ভয়ে ওদের গ্রামের রাস্তা মাড়ায়নি।''

''হুম। তারপর?''

''সে রাতটা ছিল কার্তিক মাসের চতুর্দশী, রাত পেরোলেই অমাবস্যা। পরের দিন সকালে বাকি তিনটে গোষ্ঠীর গাঁওবুড়ো আর পারিয়া-রা বাছা বাছা কয়েকজন সাহসী পুরুষ সঙ্গে নিয়ে রওনা দিল পাতরগোঁয়্যাদের গ্রামের উদ্দেশে। হাজার হোক, ওরাও দেওরি, বালিয়াবাবা আর তাম্রেশ্বরীর লোক বলে কথা। কী হল না হল সেটা তো একবার দেখে আসতে হয়, না কি?''

''তারপর?'' আমার গা বেয়ে নিজের অজান্তেই একটা শিরশিরানি ভাব উঠে আসছিল।

''আগেই বলেছি, পাতরগোঁয়্যাদের বসবাস ছিল অন্যদের থেকে বেশ একটু দূরে। তার ওপর পুরো গ্রামটাই ছিল বাঁশের উঁচু বেড়া দিয়ে ঘেরা। সামনে মস্ত বড় একটা শালকাঠের দরজা। বাইরের লোকজন ওখানে গিয়ে আওয়াজ দিলে দরজাটা খুলে যেত।

সেই অমাবস্যার দিন, গাঁওবুড়োরা যখন ওদের গ্রামে গিয়ে পৌঁছোয় তখন বিকেল পেরিয়ে সন্ধে নামছে। গিয়ে দ্যাখে চারিদিকে সব কিছু নিঝুম। অত বড় গ্রাম থেকে শুধু একটা আওয়াজই ভেসে আসছে, একটা বাচ্চার কান্নার শব্দ। এ ছাড়া চারিদিক একেবারে শুনশান।

লোকজন গিয়ে প্রথমে দরজায় ঠক ঠক করে। তারপর তাতে কারও সাড়াশব্দ না পেয়ে হাঁকডাকও করে কিছুক্ষণ। তাতেও কাজ না হওয়ায় শেষমেশ জোয়ান মদ্দরা মিলে দরজাটা একটু জোরে ধাক্কা মারে, আর দরজাটা নিজে নিজেই হাট হয়ে খুলে যায়।''

তারপর কিছুক্ষণের নৈঃশব্দ্য। আমি আর মংকু একেবারে চুপ।

''ভেতরের দৃশ্য দেখে সবাই খানিকক্ষণ হাঁ করে থাকে। তারপর দুদ্দাড় করে যে যেদিকে পারে ছুটে পালায়।''

''কেন?'' প্রশ্ন করার সময় বুঝতে পারছিলাম যে আমার হৃৎপিণ্ডটা ধকধক করছে।

''কারণ ওরা দ্যাখে যে গ্রামের মধ্যে কোথাও কোনো মানুষের চিহ্নমাত্র নেই। এমনকি সামনেই যে দেওথান, সেটাও ফাঁকা। দেওথানের সামনে একটা গাছ থেকে ঝুলছে সেই অভিশপ্ত বড়দেওরির দেহ, আর তার বাচ্চা মেয়েটা মায়ের পায়ের কাছে বসে কাঁদছে। ব্যস, এই ছাড়া মানুষজন বলতে কেউ নেই, কোথাও নেই, কিচ্ছু নেই। তার বদলে সারা গ্রাম জুড়ে ছড়িয়ে আছে শুধু ওরা।''

''কারা?''

বোধহয় নিজের অজান্তেই গলাটা নীচু হয়ে গেল পরাগের, ''কাক। গোটা গ্রাম জুড়ে ছড়িয়ে আছে অগুনতি কাক। তাদের সবার চোখ লাল, সবার ঠোঁটে রক্ত।''

* * * *

বিকেলে নিজের ঘরের আরামকেদারায় বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলাম। ঘটনা যেভাবে জট পাকিয়ে উঠেছে সেটা একবার ঠান্ডা মাথায় বুঝে নেওয়া দরকার।

গত কালকের অভিজ্ঞতা আর আজকে শোনা গল্পটা মেলাতে বেশি বুদ্ধির দরকার হয় না। পরাগের বক্তব্য অনুযায়ী, শুখানালার ওপারেই ছিল পাতরগোঁয়্যাদের গ্রাম। মানে এখন যেখানে কাউরীবুড়ির মন্দির। সেই মন্দিরের প্রধান সেবায়েত ছিলেন মহিলারা। বংশানুক্রমে নয়, মাতৃ-অনুক্রমে। পরাগের বয়ান অনুসারে, কাউরীবুড়ির অভিশাপে পাতরগোঁয়্যাদের গ্রাম ছারখার হয়ে যায়, শুধু দেবীর অভিশাপ পূরণ করার জন্যই বড়দেওরির কন্যাটি বেঁচে থাকে।

ওদিকে কাউরীবুড়ির মন্দিরের মহিলাটি বলেছিলেন একমাত্র তাঁদের পরিবারের মেয়েরা ছাড়া অন্য কারও সেখানে যাওয়া নিষেধ। হতেই পারে যে ইনিই সেই পাতরগোঁয়্যাদের বড়দেওরির উত্তরসূরি। তিনি এখনও

তাঁদের পারিবারিক অভিশাপের উত্তরাধিকার বহন করে চলছেন। আর সেই থেকে দেওরিদের বাকি উপজাতিরা কাউরীবুড়ির থানকে যমের মতো ডরায়, সন্তর্পণে এড়িয়ে চলে।

তবে যেটা আমাকে ভাবাচ্ছিল সবচেয়ে বেশি, সেটা হচ্ছে কাক। আজ অবধি কাকেদের আমি অত অদ্ভুত আচরণ করতে দেখিনি, যা কাল দেখলাম। কাউরীবুড়ির মন্দিরে অত কাক কী করছিল? তাদের অমন ভয়ংকর চাউনি কেন?

অত বছর আগে পাতরগোঁয়্যাদের গ্রামে ওরা অত কাক দেখেছিল কেন? কী হয়েছিল পাতরগোঁয়্যাদের? কীভাবে উধাও হয়ে গেল ওরা?

হয়তো চিন্তায় অত্যধিক মগ্ন হয়ে থাকার কারণেই খেয়াল করিনি যে মাধুরী কখন ঘরে ঢুকে পড়েছে। তাই ও যখন জিজ্ঞেস করল, ''কী বিড়বিড় করছেন?'' আমি তখনও ধাতস্থ হইনি। আনমনে ওর দিকে চেয়ে পালটা প্রশ্ন করে ফেললাম, ''কাউরীবুড়ির মন্দিরে গেছ কখনও?''

প্রশ্নটা শুনে হেসেই ফেলল মাধুরী, ''ধুত, কী যে বলেন! কাকের আবার মন্দির হয় নাকি?''

কথাটা মাথায় সেঁধোতে একটু সময় নিল, ''কাকের মন্দির কখন বললাম? বললাম যে কাউরীবুড়ির...''

''ওই হল। অসমিয়া ভাষায় কাউরী মানে কাক।''

কথাটা শুনে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সোজা হয়ে বসলাম। কাউরী মানে কাক? তার মানে কাউরীবুড়ি আসলে কাকেদের দেবী? মাই গুডনেস!

পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করে নিলাম। এখন আমার কাজ অন্য। কাউরীবুড়ি রহস্য নিয়ে না হয় পরে ভাবা যাবে।

সোজা হয়ে বসে মাধুরীকে সামনের চেয়ারে বসতে বললাম। তারপর প্রশ্ন করলাম, ''এবার বলো তো তোমার সঙ্গে অনির্বাণের কেসটা কী?''

প্রশ্নটা শুনে মাধুরী খানিকক্ষণ শাড়ির আঁচলটা আঙুলে জড়াল। তারপর অস্ফুটে বলল, ''কীভাবে শুরু করব বুঝতে পারছি না।''

''টেনশন নেওয়ার কিছু নেই। একদম ঠান্ডা মাথায় পরপর বলে যাও। কোনো ডিটেইলস বাদ দেবে না।''

''না না...টেনশনের ব্যাপার নয়। আসলে ব্যাপারটা এমন অদ্ভুত যে আমার নিজের পক্ষেও সেটা বিশ্বাস করা খুব মুশকিল।''

''কীরকম?''

প্রশ্নটার সরাসরি কোনো জবাব দিল না মাধুরী। তার বদলে উলটে আমাকে একটা প্রশ্ন করে বসল, ''আচ্ছা দাদা, একটা কথা বলুন, আপনি তো আমার থেকে বয়সে বড়। তার ওপর কলকাতার মতো বড় শহরে থাকেন। সেখানকার জীবন নিশ্চয়ই আমাদের এই তিনসুকিয়ার থেকে অনেক জটিল?''

ম্লান হাসলাম, ''সে আর বলতে? বড় শহরের জীবন শুধু জটিল নয়, মাকড়সার জালের মতো। সেখানে একবার যদি কেউ আটকে পড়ে, তবে তার আর নিস্তার নেই।''

''অনেক রকমের সাংসারিক অশান্তিও দেখেছেন নিশ্চয়ই?''

''তা দেখেছি বই কি! আমার কাছে ওষুধ নিতে বা কোষ্ঠীবিচার করাতে তো কম লোক আসেন না। তাঁদের কাছে যেসব গল্প শুনি, লিখতে পারলে একটা মহাভারত হয়ে যেত।''

চুপ করে গেল মাধুরী। ফের সেই অন্যমনস্ক ভাব। দেওয়ালের দিকে চেয়ে আছে। কপালে ভ্রূকুটি, চোখে চিন্তিত দৃষ্টি। যেন কোনো কিছু মনে করার চেষ্টা করছে।

''কী হল মাধুরী? কিছু ভাবছ?''

আমার এই কথায় সাড় ফিরে এল মাধুরীর মধ্যে। যেন অতল চিন্তার সমুদ্র সাঁতরে পারে এসে পৌঁছোল সে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে সেই গন্ধটা ফের নাকে এল আমার।

ভিজে কাঠ পোড়ার গন্ধ। কটু, ভ্যাপসা, শ্বাসরুদ্ধকর একটা গন্ধ।

‘‘আমি...আমি...বুঝতে পারছি না কীভাবে বলব। মানে বিষয়টা যেমন অদ্ভুত, তেমনই...তেমনই নোংরা...আর আর...’’

নড়েচড়ে বসলাম।

‘‘কাউকে বলে বোঝানো যাবে না দাদা। যাকে বলব সেই বলবে হয় আমি পাগল...নইলে আমি...আমি...ইচ্ছে করে খুব খারাপ কিছু ভাবছি...আমি একটা অত্যন্ত নোংরা মনের মেয়ে।’’

‘‘সেইজন্যই কি নিজের মা-বাবাকেও কিছু বলোনি এই নিয়ে?’’

মাথা নাড়ল মাধুরী।

‘‘হুম। তুমি এক কাজ করো। শুধু ঘটনাগুলো আমাকে পরপর বলে যাও। খারাপ না ভালো, সে বিচারের ভার নাহয় আমি নিলাম।’’

আরও খানিকক্ষণ চুপ থাকার পর মুখ খুলল মাধুরী।

‘‘আমাদের বিয়ের গল্প তো শুনেইছেন। অনির্বাণের সঙ্গে আমার আলাপ আমার এক বান্ধবীর জন্মদিনের পার্টিতে। আমাদের মধ্যে আলাপ-পরিচয় ভালোবাসায় গড়াতে দেরি হয়নি বেশি।

মা-বাবা যখন আমার জন্য সম্বন্ধ দেখা শুরু করেন, আমিই বলি অনির্বাণের কথা। ছেলে হিসেবে অনি খুব ভালো। দেখতে ভালো, পড়াশোনায় ভালো। ভালো চাকরি করে। মা-বাবার না করার কোনো কারণ ছিল না।

বিয়ের আগেও আমি ওদের বাড়ি বারকতক গেছি। অনির দিদির সঙ্গে আমার তখনই আলাপ। অনিই শিখিয়েছিল ওর দিদিকে দিভাই বলে ডাকতে।

দিভাইয়ের বিয়ে হয়েছিল ওদের মামাবাড়ির দিকের কোনো এক দূরসম্পর্কের রিলেটিভের সঙ্গে। জানি না জানেন কি না, অনির মা ছিলেন এখানকার লোক, মানে আসামিজ। অনির বাবা কলকাতা থেকে চাকরিসূত্রে এখানে চলে আসেন সত্তরের শেষাশেষি। শেষে অনির মাকে বিয়ে করে এখানেই থিতু হন। উনি মারাও যান এখানেই।’’

‘‘কবে?’’

‘‘অনি যে বছর ক্লাস টেনের বোর্ড এক্সাম দেয়, সেই বছর। দু’হাজার চার।’’

‘‘আর অনির মা?’’

‘‘তিনি মারা যান তার তিন বছর পর। অনি তখন ফার্স্ট ইয়ারে।’’

‘‘হুম। আর ওর দিদি? তিনি তখন কোথায় ছিলেন?’’

‘‘দিভাইয়ের হাজব্যান্ডও সেই বছরেই মারা যান। অনি একা আছে দেখে দিভাই এ বাড়ি চলে আসেন। সে যাই হোক। এবার আসল কথায় আসি।

ফুলশয্যার পরের দিন সকালে স্নান-টান করে আয়নার সামনে বসে চুল আঁচড়াচ্ছি, এমন সময় দিভাই এসে আমার হাতে একটা পাথরের মূর্তি দিয়ে বললেন, ‘এইটে নিজের শোওয়ার ঘরে রাখিস মাধু। আমার মায়ের দেওয়া জিনিস। তোর ভালো হবে।’

তাকিয়ে দেখি একটা কোনো দেবীমূর্তি, সাইজে আড়াই-তিন ইঞ্চির বেশি হবে না। সারা গায়ে তেল আর সিঁদুর লেপা বলে ভালো করে বোঝাও যাচ্ছে না। আমি কিছু না ভেবে আলমারির পাশে একটা তাকে তুলে রাখলাম।

পরের দিন ছিল চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি। আমাদের হানিমুন কাটাতে ভুটান যাওয়ার কথা। গোছগাছ করে বেরোতে বেরোতে দুপুর হয়ে গেল। দিভাইও বেরিয়ে গেলেন গুয়াহাটি যাবেন বলে, ওখানে নাকি কীসব অফিশিয়াল কাজকম্ম আছে।

আমরা ভুটান থেকে ফিরলাম ছ’দিন বাদে, তারিখটা এখনও মনে আছে, বিশে ফেব্রুয়ারি। দিভাই তার আগের দিনই গুয়াহাটি থেকে ফিরেছেন। আমি পরের দিন সকাল সকাল বাপের বাড়ি চলে আসি। কারণ

দু’দিন বাদে ছিল শিবরাত্রি। ইচ্ছে ছিল বিয়ের পর প্রথম শিবরাত্রিটা বাড়িতেই কাটিয়ে পরের দিনই আমি সদিয়ার বাড়ি চলে যাব। তারপর ওখানে দিনকয়েক কাটিয়ে অনির সঙ্গে ডিব্রুগড়ে ব্যাক করব।

সে যাই হোক। এ বাড়িতে এসে দুপুর নাগাদ স্নান করে আয়নার সামনে বসেছি। সিঁদুরটা পরতে যাব, এমন সময়ে মনে হল...”

বলে থমকে গেল মাধুরী। আমি তাড়া দিলাম, “কী হল, থামলে কেন? বলো!”

আমার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকাল মাধুরী। তারপর বলল, “মনে হল, কে যেন আমার কানে কানে বলছে, ‘ও সিঁদুর পরিসনি মেয়ে। ও সিঁদুরে অভিশাপ আছে। ও সিঁদুর বড় অলুক্ষুণে’।”

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইলাম। মেয়েটা স্কিজোফ্রেনিক নাকি?

আমার মনের কথাটা বোধহয় কিছুটা আঁচ করতে পারল মাধুরী। প্রশ্ন করল, “আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই না? আমার নিজেরই বিশ্বাস হয়নি। তাই তো মা-বাবাকে এসবের কিছুই বলিনি।”

“দ্যাখো, এসব কথা যে চট করে বিশ্বাস করা মুশকিল সে তো বোঝোই। হতে পারে তোমার অবচেতনে হয়তো কোনো জটিল চিন্তা কাজ করছিল, তাই হয়তো নিজে নিজেই...”

“তাই বলে তিনদিন? পরপর তিনদিন? ঠিক সিঁদুর পরার সময়টাতেই?”

থমকে গেলাম। “তিনদিন ধরে তুমি একই কথা শুনলে?”

“একদম দাদা। স্পষ্ট শুনলাম। ঠিক সিঁদুরটা পরতে যাব, তখনই।”

“হুম। তারপর?”

“তারপর শিবরাত্রির দিন সারাদিন উপোস করে রাত্রিবেলায় সামান্য ফল আর সাবুদানা খেয়ে উপোস ভাঙলাম। শরীরটা প্রচণ্ড ক্লান্ত ছিল, তাই ঘুমিয়ে পড়তে দেরি হয়নি বিশেষ।”

বলে থমকে গেল মেয়েটা।

“বলো, তারপর কী হল?”

“ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম, জানেন?”

“কী স্বপ্ন?”

“দেখলাম যে আমি যেন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কোথাও একটা যাচ্ছি। আমার পেছনে কারা যেন চিৎকার করে আমাকে বারণ করছে সেখানে যেতে। কিন্তু আমি কিছুতেই তাদের বারণ শুনছি না। আমি এগিয়ে চলেছি সেই জঙ্গলের মধ্যে। এগিয়ে চলেছি বলা ভুল, কে যেন আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে জঙ্গলের আরও ভেতরে...আর...আর...”

“আর কী?”

“আর আমার চারিপাশে গাছের ডালে বসে আছে অসংখ্য কাক। তাদের লাল লাল চোখ। আর তারা একদৃষ্টে চেয়ে আছে আমার দিকেই।”

সোজা হয়ে উঠে বসলাম। কী বলছে কী মেয়েটা?

মাধুরী বোধহয় আমার চমকে ওঠাটা খেয়াল করেনি। সে বলে যেতে লাগল, “পরের দিন সকালে উঠে দেখি মাথা টিপটিপ করছে। কিন্তু সেদিনই আমার সদিয়া ফেরার কথা। তাই জোর করেই স্নান করলাম। আয়নার সামনে বসে ফের সিঁদুর পরতে গেছি, এমন সময় আবার সেই ডাক। এবার আরও জোরে। একজন নয়, অনেকজন মিলে। ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর নখ দিয়ে আঁচড় কাটলে যেমন একটা অসহ্য শব্দ হয়, ঠিক সেরকম সুরে কারা যেন চিৎকার করে আমাকে বলছে, ‘ও সিঁদুর পরিসনি মেয়ে, ও সিঁদুর সর্বনেশে, অলুক্ষুণে’।”

“আর ইউ শিওর?” আমার গলাটা একটু কেঁপে গেল নাকি?

“একদম দাদা। ভুল হওয়ার কোনো জো-ই নেই। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা ব্যাপার ঘটল। আমার মনে হল ডান হাতের আঙুলগুলো যেন অসাড় হয়ে এসেছে, বুঝলেন? মানে মনে হল অনেক চেষ্টা

করেও আমি কবজি থেকে বাকিটা আর নাড়াতে পারছি না, কে বা কেউ যেন আমার হাতটা সজোরে টেনে ধরে রেখেছে। ব্যাপারটা ভাবুন একটু। ভরা দুপুর, চারিদিকে রোদে ঝলমল, পাশের ঘরে মা রান্না করছেন, বাইরে বাবা কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। আর এসবের মাঝখানে আমি আমার ড্রেসিং টেবিলের সামনে একদম স্থির বসে। একদম নড়তে পারছি না, চিৎকার করতে পারছি না, কানে কোনো শব্দ আসছে না, এমনকি নিঃশ্বাসও নিতে পারছি না। আমার মনে হচ্ছে যেন আমার চারিপাশের সবকিছু একদম স্থির হয়ে গেছে। দেওয়ালে টাঙানো ফটোর মতো।''

একটানে এতটা বলে হাঁপাতে লাগল মাধুরী। আমি উঠে গিয়ে একগ্লাস জল এগিয়ে দিলাম ওর দিকে। খেয়াল করলাম আমার নিজের হাতও অল্পস্বল্প কাঁপছে।

''তারপর?''

''ওইভাবেই ছিলাম বেশ কিছু মুহূর্ত। তারপর কিছুক্ষণ পর মনে হল হাতে যেন একটু সাড় পাচ্ছি। তখন অনেকখানি মনের জোর একসঙ্গে করে সিঁদুরটা পরে নিয়ে টলতে টলতে উঠে এলাম ওখান থেকে। আয়নার সামনে আর এক মুহূর্ত বসে থাকতে আমার ভয় করছিল, ভীষণ ভয় করছিল।''

এবার এক গ্লাস জল আমি খেলাম। গলাটা শুকিয়ে আসছিল আমার।

''তারপর বাকিটা বোধহয় আমি জানি। খেয়েদেয়ে ওঠার পর তোমার খুব জ্বর আসে, তাই না?''

উত্তেজিত হয়ে উঠছিল মাধুরী। এই প্রথম লক্ষ করলাম যে উত্তেজিত হলে ওর কপাল আর গাল লাল হয়ে ওঠে, নাকের পাটা ফুলে যায়। আশ্বিনের ঠান্ডাতেও হিরের কুচির মতো অল্প অল্প ঘাম জমছিল ওর কপালে।

''দাঁতে কুটোটি কেটেছি কি কাটিনি, ধুম জ্বর এল আমার। মনে হল আমাকে কে যেন একগলা বরফঠান্ডা জলে চুবিয়ে রেখেছে। খাওয়ার টেবিল থেকেই ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে কোনোমতে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি। তারপর আমার আর কিছু মনে নেই।''

আরামকেদারায় মাথাটা এলিয়ে দিয়ে চোখদুটো বন্ধ করলাম একবার। তারপর চোখ খুলতেই ক্ষণিকের জন্য মনে হল একবার যেন দেখলাম যে মেয়েটার মাথার সিঁথিটা ফাঁকা, হাতে কোনো সধবার চিহ্ন নেই, আর যে শাড়িটা পরে আছে সেটার রং সাদা!

আবার চোখ বন্ধ করলাম। সারাদিনের মানসিক পরিশ্রমের পর বোধহয় আমার স্নায়ু বোধহয় এবার জবাব দিতে শুরু করেছে। নইলে এরকম ভুলভাল দৃশ্য দেখব কেন?

ঠিক তখনই ফের সেই গন্ধটা নাকে এল। ভিজে কাঠ পোড়ার ভ্যাপসা শ্বাসরুদ্ধকর গন্ধটা।

মাধুরীকে ভিতরে বসতে বলে বাইরে এসে একটা সিগারেট ধরালাম। আমার চোখের সামনে তখন দিগন্তবিস্তৃত অন্ধকার রাত্রি। মাথার ওপর পরিষ্কার আকাশ, সামান্য মেঘ জমেছে ঈশান কোণে। কাকুর বাড়ির সামনের কুয়োতলাটা পেরোলেই একটা ছোট বাগান। সেখান থেকে শিউলির মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছিল। বাড়ির সীমানা ঘেঁষে সুপুরিগাছের সারি। এখানকার লোকজন খুব পান খায় দেখেছি, আর সঙ্গে কাঁচা সুপুরি। একবার সে জিনিস শখ করে খেতে গিয়ে প্রায় উলটে পড়ে যাচ্ছিলাম, বাবা রে! সে কী সাংঘাতিক জিনিস! এরা খায় কী করে?

এসব আবোলতাবোল ভাবছি, এমন সময় আনমনে কুয়োতলার দিকে তাকাতেই আমার মনে হল সামনের কুয়োতলা দিয়ে স্যাঁৎ করে কে একটা যেন বাড়ির ভেতরে চলে গেল। শুধুমাত্র সাদা কাপড়টা নজরে এল আমার, আর খানিকটা উড়ন্ত চুল। আমি 'কে, কে ওখানে' করে চেঁচিয়ে উঠলাম।

আমার ডাক শুনে মাধুরী বাইরে বেরিয়ে এল। প্রশ্ন করল, ''কোথায় কে?''

''ওই যে'', বলে আমি কুয়োতলার দিকে আঙুল দেখালাম, ''মনে হল ওখান দিয়ে কে যেন বাড়ির ভিতরে চলে গেল।''

ইতিমধ্যে কাকু আর কাকিমাও বেরিয়ে এসেছিলেন। দুজন কাজের লোক ভেতরে ব্যস্ত ছিল। তারাও কাজ ছেড়ে বেরিয়ে এল। আমার কথা শুনে বাড়ির আনাচকানাচ তন্নতন্ন করে খোঁজা হল। কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না।

চোখের ভুলই হবে হয়তো। আমি আর ব্যাপারটা নিয়ে বেশি ঘাঁটালাম না। মাধুরী আর আমি ভেতরে এসে বসলাম।

''তারপর? পরের দিন সকালে হঠাৎ করে তোমার জ্বর সেরে যায়, তাই তো?'' আলোচনাটা যেখানে এসে থেমে গেছিল, ঠিক সেখান থেকেই শুরু করলাম।

''সেদিন সারারাত ধরে বীভৎস সব স্বপ্ন দেখি, জানেন? প্রতিটা স্বপ্ন এত জ্যান্ত যে আমার এখনও মনে আছে। কখনও দেখছি আমাকে ঘিরে মুখে বিচিত্র উল্কি আঁকা উলঙ্গ মানুষের দল, অদ্ভুতভাবে নাচছে। আবার কখনও দেখছি আমার সামনে একটা মস্ত বড় হাড়িকাঠ, সেখানে নরবলি হচ্ছে, আর সেই বলির রক্ত আমার দু'পায়ে মাখিয়ে দিচ্ছে কেউ। আবার একবার দেখলাম দুপুরবেলা খাঁ খাঁ করা শ্মশানের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, চারিদিকে কোত্থাও কিচ্ছু নেই। আর আমার মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে কাকেদের দল। মানে সব মিলিয়ে ভয়ংকর আর ভীষণ ভয় ধরানো এক-একটা স্বপ্ন।''

আমার মাথাটা টিপটিপ করতে লাগল। জ্বর আসবে নাকি?

''ভোরের দিকে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। একটা খুব কষ্টের স্বপ্ন দেখলাম, জানেন? দেখলাম কে যেন আমার পা দুটো বেঁধে জলের মধ্যে ফেলে দিয়েছে, আর আমি ক্রমেই ছটফট করছি, প্রাণপণে বাঁচতে চাইছি। এমন সময় কী করে জানি আমার পা থেকে সেই বাঁধন খুলে গেল, আর আমি প্রাণপণে সাঁতার কেটে ওপরে উঠতে শুরু করলাম। উঠতে উঠতে ঠিক যেই আমার মাথাটা জলের ওপর ভেসে উঠল, ঠিক সেই সময় আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখি আমার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে সপসপ করছে। বিছানার পাশে একটা মোড়ায় বসে মা জলপট্টি দিচ্ছিলেন বোধহয়। তিনি সেখানে বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁর হাতদুটো আমার কাঁধে। আর আমার সমস্ত জ্বরজারি, শরীর খারাপ, সবই ম্যাজিকের মতো উধাও।''

একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম মাধুরীর দিকে। মনোবিজ্ঞান নিয়ে এককালে একটু-আধটু জানতে হয়েছিল আমাকে। স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে ফ্রয়েড বা ইয়ুং সাহেবের বিস্তারিত গবেষণাও পড়া আছে আমার। কিন্তু আমার মন বলছিল সেসব তত্ত্ব দিয়ে এই স্বপ্নগুলো বোঝার চেষ্টা করাটা বৃথা। এর পেছনে কোনো গূঢ় রহস্য আছে।

মাধুরীকে বললাম যে ওর কাহিনির বাকিটা কাল শুনব। আজ আর শরীর দিচ্ছে না। আজ রাতে যে খাব না, সেটা ও যেন কাকিমাকে বলে দেয়।

মাধুরী চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, ''আর একটা কথা মনে পড়ে গেল।''

''কী?''

''স্বপ্নের মধ্যে যখন জলের ওপরে উঠে আসছি তখন মনে হল ওই জলের মধ্যেই আমার শরীর ঘিরে যেন আলোর বন্যা বইছে, সেই আলোয় জলের অতলে বহুদূর অবধি দেখা যাচ্ছে। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি, যে জিনিসটা দিয়ে আমার পা দুটো এতক্ষণ বাঁধা ছিল, সেটা খুলে ধীরে ধীরে নীচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছে। আর সেটা কোনো দড়ি নয়।''

''তাহলে? কী সেটা?''

''ওটা একটা লতা। আর তার মাথাটা ছোবল দিতে ওঠা সাপের ফণার মতো।''

* * * *

পরের দিন সকালে উঠে শুনি মংকু আসেনি কোন একটা কাজের অজুহাতে। আমারও সেদিন আর অন্য কিছু করার ইচ্ছে ছিল না। ভাবলাম আজ একটু তিনসুকিয়া শহরটা ঘুরে দেখি।

বেরিয়েছিলাম কাকুর সাইকেলটা সঙ্গে নিয়ে। সবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সামনের মোড়টা ঘুরেছি, ছেলেটার মুখোমুখি পড়ে গেলাম একেবারে।

অথচ সদানন্দকাকুর বাড়ির দিকে উঁকিঝুঁকি না মারলে হয়তো ছেলেটাকে লক্ষই করতাম না, পাশ কাটিয়ে চলে যেতাম। কারণ প্রথমত ছোকরাকে দেখতে আহামরি কিছু না। পরে আছে সাধারণ জামাকাপড়। চুল উশকোখুশকো, গালে অনেকদিনের না-কামানো দাড়ি। অমন লোক তিনসুকিয়ার রাস্তায় হাজার একটা দেখেছি।

ছেলেটাকে দেখে সাইকেলের ব্রেক কষলাম জোরে। ও বাড়িতে উঁকিঝুঁকি মারার কারণটা কী জানতে হচ্ছে তো।

সাইকেল থামাতেই ছেলেটা আমার দিকে একঝলক চাইল। লক্ষ করলাম যে ছোকরা এখানকার লোক বটে, মুখ-চোখ সেইরকমই। আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সে ছোকরা উলটোদিকে দিল সোজা দৌড়!

দ্রুত সাইকেলে করে ধাওয়া করেও লাভ হল না। একটু এগিয়ে গলির শেষ। সেখান থেকে বাঁদিকে ঘুরে দেখি তার টিকিটির চিহ্ন অবধি নেই। সে কোথায় মিলিয়ে গেল কে জানে!

আমিও আর ব্যাপারটা নিয়ে বেশি ঘাঁটালাম না। হাজার হোক লোক্যাল ছেলে। বেশি জানতে গিয়ে যদি কোনো বিপদ হয়? আমি আর মাথা ঘামালাম না, সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

এতালা-বেতালা চালাতে চালাতে দেখি বেংপুখুরির রাস্তা ধরে, দুর্গাবাড়ির পাশ কাটিয়ে তিনসুকিয়া উইমেনস কলেজের কাছে এসে পৌঁছেছি। তখন কলেজ শুরু হওয়ার সময়, ছাত্রীরা সবে আসা শুরু করেছে। গেটের উলটোদিকে রাস্তার ওপারে সাইকেলের জটলা। সেই সাইকেল-তমালরাজির পাশে রয়েছে সদ্য গোঁফ ওঠা ছেলেদের দল।

সাইকেলটা একবার দাঁড় করালাম আমি। আচ্ছা, আজ যদি মাধুরী এই কলেজে এখন পড়তে আসত, আমি কি তাহলে এইভাবেই এইসব ছেলেদের দলে দাঁড়িয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করতাম? অপেক্ষা করতাম মাধুরীকে একবার দেখার জন্য?

ভাবনাটা মাথার মধ্যে আসতেই আমি থমকে গেলাম। ছি ছি ছি, মাধুরীকে নিয়ে এসব কী ভাবছি আমি! এরকম একটা নোংরা চিন্তা আমার মাথায় এল কী করে? মাধুরী আমার বোনের মতো না? কাকু-কাকিমা আমাকে ভালোবেসে আশ্রয় দিয়েছেন তাঁদের বাড়িতে, তাঁদের একমাত্র কন্যার বিপদে আমার সাহায্য চেয়েছেন, আর আমি তাকে নিয়ে এইসব উলটোপালটা ভাবছি? ছি ছি ছি! আমি কি পাগল হয়ে গেলাম নাকি?

কলেজের গেটের ঠিক উলটোদিকে একটা পানের দোকান ছিল। তার সামনে একটা ভাঙাচোরা বেঞ্চি পাতা। ধীরেসুস্থে সেখানে সাইকেলটা স্ট্যান্ড করে দোকানিকে একটা গোল্ড ফ্লেক দিতে বললাম। তারপর দোকানের পাশে ঝুলতে থাকা নারকেলের জ্বলন্ত দড়ি থেকে সেটা ধরিয়ে একটা বুক খালি করা গভীর টান দিলাম।

তামাক পোড়া ধোঁয়াটা পাক খেতে খেতে আমার বুকের গভীর অন্ধকারে সেঁধিয়ে যেতে থাকল। নিকোটিনের প্রথম ধাক্কাটা মগজে পৌঁছোতেই স্নায়ুগুলো সামান্য সজাগ হয়ে উঠল বটে, কিন্তু মাথার জটটা ছাড়ল না।

সিগারেটটা শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। কলেজ শুরু হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, মেয়েরা সব ভেতরে চলে গেছে। সাইকেল আরোহী ছেলেদের দলও এখন ঘরে ফেরার তালে। মাথার ওপর আশ্বিনের মিঠে রোদ চড়চড় করছে। যদিও আকাশের অর্ধেকটা মেঘে ঢাকা। দিন দুয়েকের মধ্যে বৃষ্টি নামবে মনে হয়।

ভাবলাম একবার নদীর দিকটায় যাই। ঠান্ডা হাওয়া খেয়ে যদি মাথার জটটা একটু ছাড়ে। সেইমতো রাঙ্গাগড়া রোডটা ধরলাম।

তখন তিনসুকিয়ার রাস্তার অবস্থা ছিল খুব করুণ। কোনোমতে খানাখন্দ পেরিয়ে সবে নতুনমাটি টি ফ্যাক্টরির কাছে পৌঁছেছি, এমন সময় মনে হল পেছন থেকে কে যেন নাম ধরে ডাকছে না?

সাইকেলটা সাইড করলাম। অচেনা-অজানা জায়গায় কে নাম ধরে ডাকে ভাই?

তাকিয়ে দেখি পরাগ বসুমাতারি। রাস্তার ওপার থেকে আমার দিকে প্রবল বেগে হাত নাড়াচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে। আমাকে দাঁড়াতে দেখে দৌড়ে এল আমার কাছে, ''কী আশ্চর্য! আপনি এখানে? আমি তো আপনার খোঁজে আপনার বাড়ির দিকেই যাচ্ছিলাম।''

''কী ব্যাপারে?''

পরাগ গলাটা নামিয়ে বলল ওই কাউরীবুড়ির মন্দিরের ব্যাপারে ও আমাকে একজনের সঙ্গে দেখা করাতে চায়। তাতে আমার উপকার হলেও হতে পারে।

''কে সেই লোক?''

''আমার বড় ঠাকুর্দা।''

জানা গেল পরাগের বড় ঠাকুর্দা, অর্থাৎ ঠাকুর্দার দাদার বয়েস প্রায় নব্বইয়ের কাছাকাছি। বুড়োর নাকি টুকটাক হাতুড়ে বিদ্যায় খ্যাতি আছে কিছু। এখনও গ্রামে-গঞ্জে লোকজন কাছে আসে জড়িবুটি নিতে। তা ছাড়া পুজোপার্বণের দিন দেখে দেওয়া, জলপড়া, বাটি চালানো, ভূত ছাড়ানোর মন্তর, এসবেও বুড়োর হাতযশ খুব।

কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমার লাভ?

পরাগ জানাল যে ওর বড় ঠাকুর্দা হচ্ছেন দেওরিদের লোককথা বা উপকথার জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া বিশেষ। ওদের সমাজের হেন গল্প নেই, হেন প্রথা নেই, হেন কাহিনি নেই যা উনি জানেন না। কালকে রাতে পরাগ গিয়ে ওঁকে জানিয়েছে আমার কাউরীবুড়ির মন্দিরে যাওয়ার কাহিনি। তাতে নাকি তিনি ভীষণ উত্তেজিত। আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে একেবারে উঠেপড়ে লেগেছেন। সদানন্দকাকুকেও উনি ভালোভাবেই চেনেন। আজ সকালে নিজেই রওনা দিয়ে দিচ্ছিলেন প্রায়। অনেক কষ্টে ওঁকে থামিয়ে আমার খোঁজে বেরোচ্ছিল পরাগ। ভাগ্যক্রমে আমাকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে যায় ও।

পরাগের সঙ্গে যেতে কোনো আপত্তি ছিল না আমার। কৌতূহলও হচ্ছিল বিস্তর।

জঙ্গল কেটে বানানো মেঠো রাস্তা পেরিয়ে পরাগের সঙ্গে ওদের গ্রামে পৌঁছোতে সময় লাগল মিনিট বিশেক। গ্রাম বললে অবশ্য যে ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার সঙ্গে মিল সামান্যই। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছোট পাড়া বললেই ঠিক হয়। সব একতলা পাকা বাড়ি। মাথায় অ্যাসবেস্টসের ছাউনি, এখানে বলে ঢেউটিন। পাড়ার পুরুষেরা বোধহয় কাজের ধান্দায় বেরিয়েছে সব। আমাকে দেখে বউ-ঝিরা উঁকিঝুঁকি মারার চেষ্টা করতেই পরাগের ধমক খেয়ে অন্দরে লুকোল। বুঝলাম পরাগের বেশ প্রতাপ আছে মহল্লায়।

পরাগের বাড়িটা গ্রামের একদম শেষে। দেখে বোঝাই যায় এরা হল গিয়ে গ্রামের সবচেয়ে সম্পন্ন গৃহস্থ। বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে বানানো একতলা বাড়ি। সামনেটায় খানিকটা ছড়ানো জমি। তাতে শাকসবজি চাষ করা হয়েছে। চোখের আন্দাজে বুঝলাম যে বাড়ির পেছনের দিকেও বেশ বড় গোছের একটা বাগান-টাগান আছে।

আমাকে বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে বারান্দায় একটা চাটাই পেতে বসতে দেওয়া হল। ভেতর থেকে ভারী কাঁসার গ্লাসে ঠান্ডা জল এল, সঙ্গে কিছু স্থানীয় মিষ্টি গোছের জিনিস। সেসব খেতে খেতেই দেখি পরাগ হাত ধরে এক বয়স্ক ভদ্রলোককে বাইরে নিয়ে আসছে।

বড় ঠাকুর্দা এসে বসলেন আমার সামনে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম। উনিও কাশতে কাশতে দু'হাত তুলে প্রতি-নমস্কার করলেন। হাতের মুঠোয় বেতের লাঠিটি ধরা।

বুড়োবাবু দেখলাম খিলাড়ি লোক। দুম করে প্রসঙ্গটায় ঢুকলেন না। আমি কলকাতার লোক শুনে প্রথমে খানিকক্ষণ বাঙালিদের সুখ্যাতি করলেন। সুভাষচন্দ্র বসু দেশের প্রধানমন্ত্রী হলে যে আজ দেশের এই হাল

হত না সে কথাটা জোর দিয়ে বললেন। কলকাতার এখনকার হালচাল জিজ্ঞেস করলেন কিছু। ট্রাম জিনিসটা কী করে ওই ভিড় রাস্তায় চলে সে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। মিঠুন চক্রবর্তীর অভিনয় নিয়ে কিছু উচ্চাঙ্গের আলোচনা হল। ততক্ষণে স্টিলের গ্লাসে চা এসে গেছে। চায়ের কাপে একটা চুমুক দিলেন প্রথমে। তারপরেই বলিরেখাঙ্কিত মুখখানি তুলে, সরু চোখদুটো আরও সরু করে প্রশ্ন করলেন—

''তারপর বাবু, আমার নাতি যা বলছে সেটা ঠিক নাকি, অ্যাঁ?''

বুড়োকে আমার বেশ পছন্দ হয়ে গেছিল। হাসিমুখে বললাম, ''হ্যাঁ, একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক।''

''কিন্তু বাবু, আপনি যে সত্যি বলছেন, সেটা বুঝব কী করে?''

গতকাল পরাগকে যে কড়া জবাবটা দিয়েছিলাম সেটা মুখে এসে গেছিল। কিন্তু ওই যে বললাম, বুড়ো লোকটাকে বেশ পছন্দ হয়ে গেছিল আমার। তা ছাড়া বুড়োর এত কৌতূহল কেন সেটাও তো জানা দরকার। বলা যায় না, যে কাজে এসেছি সেটার জন্য লোকটা হয়তো অযাচিতভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। বলা তো যায় না!

হাসিমুখে বললাম, ''প্রমাণ তো সেরকম কিছু নেই দাদু। একটা ছবি তুলতে গেছিলাম, তাতেই সেই ভদ্রমহিলা তো এমন হাঁইমাই করে উঠলেন যে...''

''মহিলা? কোন মহিলা?'' বুড়োর দৃষ্টি আর স্বর দুটোই তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। পরাগ বারান্দার একটা থামে হেলান দিয়ে বসেছিল। সেও দেখলাম উঠে বসেছে, চোখে বিস্মিত দৃষ্টি, ''মহিলা? কই, কাল তো কোনো মহিলার কথা বলেননি আমাকে!''

''কাল আর তোমাকে কিছু বলার সময় পেলাম কোথায়? শুধু তো শুনলাম।''

বুড়ো একটু কাছে ঘনিয়ে এল। পরাগকে বলল বারান্দা থেকে ভেতরে যাওয়ার সদর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে একবার চারপাশটা ঘুরে দেখে আসতে, কেউ আছে কি না। তারপর আমাকে চাপাস্বরে বললেন, ''কীভাবে কোথা থেকে ওখানে গেলেন, কী কী হল সেটা একবার আমাকে আগাগোড়া খুলে বলুন তো বাবু।''

পুরো ঘটনাটাই বললাম ওঁকে। কিচ্ছু বাদ দিলাম না। আমার ওখানে যাওয়া, ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা হওয়া, এমনকি পুজোপদ্ধতিটাও।

কথা শেষ হওয়ার পর দেখি বুড়োর মুখ উত্তেজনায় থমথম করছে। পরাগ ভেতর থেকে বুড়োর জন্য হুঁকো মতন কী একটা এনে দিল। বুড়ো সেটাতে গুড়ুক গুড়ুক টান দিল দুবার। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ''জানি না বাবু আপনার বাপ-দাদারা কী কী পুণ্যি করে গেছেন। নইলে আজ অবধি কাউরীবুড়ির মন্দিরে কেউ যেতে পেরেছে অথবা গেলে ফিরতে পেরেছে বলে শুনিনি। আমার জানাশোনার মধ্যে আপনিই একমাত্র লোক।''

''সে কথা তো পরাগও বলছিল বটে। কিন্তু কেন বলুন তো?''

''সে বড় ভয়ংকর জায়গা বাবু। মরণ না ডাকলে ওখানে কেউ যায় না। আমরা বলি নরকের দরজা।''

''নরক? নরক কেন?''

''সে অনেক কথা বাবু। পরাগ আপনাকে যেটুকু জানে শুধু সেটুকুই বলেছে। ওর বাইরেও ওই মন্দির ঘিরে যে কত কিছু আছে সেসব আপনার ধারণার বাইরে।''

''যেমন?''

''আপনি কী ভাবছেন, ওই লতা যেমন-তেমন সাধারণ লতা? আপনি তুলে নিয়ে অন্য কোথাও পুঁতবেন আর ও শাকপাতার মতো তরতরিয়ে বেড়ে উঠে ফুল ফোটানো শুরু করবে? সেটি হবার নয় গো বাবু।''

সেই মহিলার শেষ কথাটা মনে পড়ে গেল। কাউরীবুড়ির কাছে বলি দেওয়া প্রাণীর রক্ত ছাড়া ও ফুল বাঁচে না।

''শুনুন বাবু, ও ফুল বড় সাংঘাতিক জিনিস। ও এ দুনিয়ার ফুলই নয়, সাক্ষাৎ পাতাল থেকে তুলে আনা অভিশাপ। ওর মোহে একবার যে পড়েছে তার আর বাঁচার কোনো পথ নেই, তার মহাসর্বনাশ অনিবার্য। আমাদের পূর্বপুরুষেরা বলতেন যে কেউ যদি অম্বুবাচীর দিনে গভীর রাতে কাউরীবুড়ির পুজো করে ওই ফুলের রস খায়, তাহলে তার নাকি শয়তানের ক্ষমতা জন্মায়। তখন সে মরা মানুষ বাঁচাতে পারে, বাঁজা মেয়েমানুষের পেটে বাচ্চা এনে দিতে পারে, জীয়ন্ত মদ্দাকে ভেড়া বানিয়ে দিতে পারে।''

''এসব কে বলেছে আপনাকে?''

''আমাদের পূর্বপুরুষের থেকে শোনা কথা গো বাবু। অবশ্য তারাও কেউ ওই ফুল চক্ষে দেখেনি, শুধু নামই শুনেছে।''

''কিন্তু একটা কথা বলুন দাদু, সেক্ষেত্রে তো পাতরগোঁয়্যাদের গোষ্ঠীর সব্বারই অলৌকিক ক্ষমতা থাকার কথা, তাই না?''

''না বাবু, ওদের সবাই যে গোলকপুষ্পের লতা ইচ্ছেমতো হাতের কাছে পেত তা তো নয়। এই লতার চাষ হত খুব গোপনে, বুঝলেন কি না।'' বুড়ো আরও খানিকটা ঝুঁকে এল আমার দিকে, যেন কোনো একটা গোপন খবর দিচ্ছে, ''একমাত্র বড়দেওরি আর তাদের পরিবারের মেয়েরা ছাড়া কেউ জানতই না এই ফুলের পরিচর্যা কী করে করতে হয়।''

''আর তাদের যদি বিয়ে হয়ে যেত অন্য গোষ্ঠীর কোনো ফ্যামিলিতে? তারা জেনে যেত না?'' প্রশ্ন করি আমি।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল বুড়ো, ''না বাবু, সেটা হত না। কারণ ওদের জন্য নিয়ম ছিল আলাদা। বড়দেওরি পরিবারের মেয়েদের বিয়ে হত ওদের সমাজের মধ্যেই।''

''কেন? ওদের জন্য অন্য নিয়ম কেন?''

''কারণ, বড়দেওরির রক্ত যাতে বিশুদ্ধ থাকে। অন্য জাতের রক্ত ওরা ভেজাল মনে করত কি না! বড়দেওরির গর্ভে সন্তান এনে দেওয়া কি সাধারণ মানুষের কম্ম?''

''তাহলে?''

''ওদের সমাজে একটি সুলক্ষণযুক্ত যুবককে ছোট থেকে এই উদ্দেশ্যেই বড় করে তোলা হত। তাকে বলা হত দেওধারী, মানে দেবতাকে ধারণ করেন যিনি। তাঁর থেকে পরবর্তী বড়দেওরির জন্ম হবে, সে যে মস্ত পুণ্যের কাজ। মহা ধুমধাম করে তাঁর সঙ্গে বড়দেওরির বিয়ে হত। তারপর বড়দেওরির গর্ভাধানের খবর এলে তো কথাই নেই! পাতরগোঁয়্যাদের গ্রাম জুড়ে উৎসব। বলিদানই চলত প্রায় হপ্তাখানেক ধরে। সেসব প্রসাদ পুরো গ্রামে বাঁটোয়ারা হত।''

''বাপ রে! তাহলে সন্তান জন্মালে কী করত ওরা?''

''সেদিন তো আনন্দে পাগল হয়ে যেত ওরা। আরও বড় মোচ্ছব হত। দেওরিদের বাকি গোষ্ঠীদের সব্বাইকে নেমন্তন্ন করে পাত পেড়ে খাওয়ানো হত, সঙ্গে দেদার মদ। সেদিন বড়দেওরির থানে যার যা ইচ্ছে নজরানা দিয়ে যেত। সে বড় পুণ্যের দিন।''

''সেসব নজরানা কি বড়দেওরিই পেতেন? তাঁর স্বামী কিছু পেতেন না?''

''হা হা হা...ভাগ? পেতেন বই কি! সেদিনই সে হতভাগা ছেলের ভাগে বেঁচে থাকার মেয়াদ নির্দিষ্ট হয়ে যেত কি না।''

''মা...মা...মানে? বেঁচে থাকার মেয়াদ নির্দিষ্ট হয়ে যেত মানে?'' আমি তুতলে যাই।

''কারণ বড়দেওরির সন্তান, যে কিনা সবসময় মেয়েই হত, তার এক বছর পূর্ণ হওয়ার দিনেই বড়দেওরির হতভাগ্য স্বামীটিকে কাউরীবুড়ির সামনে বলি দেওয়া হত।''

কথাটা শুনে বাক্যহারা হয়ে গেলাম। এর মানে? সন্তান জন্মানোর পরেই প্রধানা পুরোহিতের স্বামীকে কাউরীবুড়ির সামনে বলি দেওয়া হত? কেন?

বুড়ো বোধহয় আমার মনের কথাটা আঁচ করে নিল। ধীরে ধীরে বলতে লাগল, ''কারণ মেয়ে জন্মানোর পরেই বড়দেওরিকে বিধবা হতে হত। এটাই ছিল ওদের প্রথা।''

আমি চুপ।

''সেই মেয়ের যেদিন এক বছর বয়েস হত, সেদিনই সাজিয়ে-গুছিয়ে তাকে আর তার হতভাগ্য বাবাকে নিয়ে যাওয়া হত কাউরীবুড়ির মন্দিরে। সেদিন ওদের গ্রামে মস্ত উৎসব। তারপর মহাধুমধাম করে পুজোর পর সেই ছেলেটিকে কাউরীবুড়ির সামনে বলি দেওয়া হত। বলির রক্তে স্নান করানো হত বাচ্চা মেয়েটিকে। সেটাই তার দীক্ষা, সেইদিনই সে যোগ্য বলে বিবেচিত হত পরের বড়দেওরি হওয়ার জন্য।''

হা ঈশ্বর, বাবার রক্তে এক বছরের মেয়ের স্নানদীক্ষা?

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। আমার আর কথা বলার ইচ্ছে ছিল না একদমই। মনটা ভারী বিষণ্ণ হয়ে ছিল। চটকা ভাঙল পরাগের কথা শুনে, ''তাহলে কী ভাবলেন বাবু?''

''কী ভাবব বলো? কীসের ব্যাপারে?''

''ওই গোলকপুষ্পের লতা তুলে আনার ব্যাপারে?''

বুড়োর গল্প শুনে একটা বিষণ্ণ ভাব মনের মধ্যে ছেয়ে থাকাতে কথাটা মাথায় ঢুকতে একটু সময় নিল। অবাক হয়ে বললাম, ''সে কী? এই যে বললাম ওই মহিলা বলেছেন ও লতা নাকি বলির রক্ত ছাড়া বাঁচে না, ও লতা তুলে কোনো লাভ নেই!''

''ধুস, কী যে বলেন দাদা'', নার্ভাস হাসল পরাগ, ''আপনারা হলেন গিয়ে লেখাপড়া জানা শহুরে লোক, সমাজের মাথা। এখন আপনারাও যদি এইসবে বিশ্বাস করতে শুরু করেন, তাহলে আর আমরা যাই কোথায় বলুন তো? শুনুন দাদা'', এই বলে আরও কাছে ঘেঁষে এল পরাগ, ''বলছি কী, একবার যখন আপনি ওখানে যেতে পেরেছেন, আমার মনে হয় আরেকবারও পারবেন। কি, পারবেন না?''

আমি চুপ করে রইলাম, পরাগ যেন সাহস দেওয়ার জন্যই বলতে লাগল আমাকে, ''আর এবার নাহয় আমিও যাব আপনার সঙ্গে। এই এলাকার যাবতীয় খোঁজখবর আমার নখদর্পণে, বুঝলেন কি না। আমার ওই জঙ্গলের ব্যাপারে জানাশোনা, আর আপনার সাহস, এই দুটো মিলিয়ে আমরা একটা সামান্য লতা মাটি থেকে খুঁড়ে তুলে আনতে পারব না?''

কথাটা শুনে বিস্মিত হলাম। আমার ধারণা ছিল এই উপজাতিদের মধ্যে কুসংস্কার জিনিসটা খুব প্রবল। এসব থেকে তারা শতহস্ত দূরে থাকতে চায়। কিন্তু এই পরাগ তো দেখছি একেবারে তার অ্যান্টিথিসিস। ইচ্ছে করে বাঘের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে!

বুড়োর দিকে তাকালাম। তিনি চোখ বন্ধ করে গুড়ুক গুড়ুক করে তামুক ফুঁকছেন। কথাগুলো তাঁর কানে যাচ্ছে কি না বোঝা যাচ্ছে না।

''শুনুন দাদা, কাল বাদে পরশু অমাবস্যা। জঙ্গলের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে যাওয়ার এর থেকে ভালো দিন আর হয় না।''

আশ্বিন মাসের অমাবস্যা? মানে মহালয়া?

''কিন্তু...কিন্তু...কেন? একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না পরাগ'', যে কথাটা মনের মধ্যে ঘূর্ণির মতো অনেকক্ষণ ধরে পাক খাচ্ছিল, সেইটে এবার সরাসরি আছড়ে পড়ল লোকটার ওপর, ''তোমার এই বিষয়ে এত ইন্টারেস্ট কীসের? তোমাদের সমাজের এত গোপন বিষয়, যে কথা আমার জানার কথাই নয়, সে কথা নিজে এসে আমাকে জানিয়েছ। এখানে নিয়ে এসেছ তোমার বড় ঠাকুর্দার সঙ্গে কথা বলাতে। এখন বলছ ওই গোলকপুষ্পের লতা তুলে আনার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে চাও... সত্যি করে বলো তো পরাগ, তুমি চাইছটা কী?''

পরাগ বসুমাতারি একবার আড়চোখে তার বড় ঠাকুর্দার দিকে চাইল। আমিও ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম বুড়ো একমনে তামুক টেনেই যাচ্ছে। উঠোনে বোনা সুপুরি গাছের ছায়া দুলছিল বুড়োর ভাঙা গালে। কেন জানি না

ক্ষণিকের জন্য মনে হল চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠেছে লোকটার।

গলাখাঁকারি দিল পরাগ, ''দেখুন দাদা, আমি এ যুগের লোক। ওসব ফালতু পুরোনো গালগল্পে বিশ্বাস করি না বিশেষ। আমি বুঝি টাকা, বুঝলেন দাদা, টাকা, মানে হার্ড ক্যাশ,'' এই বলে ডান হাতটা আমার সামনে একটু এগিয়ে তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে টাকা গোনার ইঙ্গিত করল পরাগ। ''টাকা ছাড়া আমি আর কিচ্ছু বুঝি না দাদা।'' চোখের কোনা দিয়ে অল্প হাসল পরাগ।

তখন নব্বই দশকের মাঝামাঝি। উদার অর্থনীতির খোলা হাওয়া আমাদের ঘরের অন্দরমহলের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছে। চোখের সামনে দেখছি পারিবারিক মূল্যবোধ এক এক করে ভেঙে পড়ছে, শিক্ষাদীক্ষার বদলে দামি হয়ে উঠতে শুরু করেছে টাকার ঝনঝনানি। ভাবলাম পরাগও বুঝি তারই শিকার। সংস্কারহীনতার ঘোমটার আড়ালে লোভের খ্যামটা নাচতে চাইছে।

আমি মনস্থির করে নিলাম। আমিও তো এসেছিলাম টাকার খোঁজেই, না কি? এখন একই পথের পথিক অন্য কাউকে ছিছিক্কার করলে চলবে? আমি করলে লীলা, আর পরাগ করলেই বিলা?

মনের থেকে এসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিলাম। ওকে বলে দিলাম যে পরশু রাতের এক্সপিডিশনের জন্য আমি রেডি। বাকি কথাবার্তা নাহয় পরশু সকালেই হবে।

ফিরে আসার সময় খেয়াল করলাম যে কোথাও একটা অস্বস্তি হচ্ছে। কী যেন একটা হিসেব মিলছে না। কাল বাদে পরশু আমার অভিযানের শেষ পর্যায়ের কাজ শুরু হবে, এবার হয় এসপার নয় ওসপার। এই সময় আমার উত্তেজনা আর উৎসাহের তুঙ্গে থাকার কথা, তাই না? কিন্তু তার বদলে নিজেকে এত ক্লান্ত লাগছে কেন?

মাথার ভেতর এতোলবেতোল ব্যাপারটা একটু থিতিয়ে নিতে দিলাম। খানিকটা ভাবার পর মনে হল এর কারণ মাধুরী নয় তো? হতেই তো পারে যে আমার অবচেতনে আমার সাফল্যের চাইতে ওর অমঙ্গলের আশঙ্কাটাই আমার কাছে বড় হয়ে উঠছে? ওর সিঁদুর পরার সময় কানের কাছে শোনা অশরীরী ডাক, ঘুমের মধ্যে দেখা ভয়ংকর স্বপ্নগুলো, সবই খুব অস্বাভাবিক লাগছিল আমার কাছে।

মাধুরীর স্বপ্নের সঙ্গে আমার কাউরীবুড়ির মন্দিরে যাওয়ার ঘটনার এত মিল হয় কী করে?

আবার মনে পড়ে গেল সেই কাকেদের দল, গাছের ডালে ডালে তাদের নিঃশব্দে উড়ে আসা। শীতল খুনে দৃষ্টিতে আমার দিকে তাদের তাকিয়ে থাকা।

অত কাক কেন? তাদের চোখ অত লাল লাল কেন?

পরাগের বাড়ি থেকে ফিরে আসার পথে নিজের অজান্তেই আবার সেই প্রশ্নটা আমার মাথায় ধাক্কা দিতে শুরু করল। কী হয়েছিল পাতরগোঁয়্যাদের গ্রামে? ওরা সবাই উধাও হয়ে গেল কী করে? ওখানে অত কাক কী করছিল?

আমি আমার মনস্থির করে ফেললাম। এ রহস্যের সমাধান আমার একার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কুলোবে না।

এখন যেমন এত মোবাইল ফোনের রমরমা, তখন সেরকম ছিল না। রাস্তার পাশের পানওয়ালাকে জিজ্ঞেস করে একটা ফোন বুথের খোঁজ পাওয়া গেল। সেখান থেকে শিলিগুড়িতে একটা এসটিডি কল করলাম।

কাকার সঙ্গে আমাকে এখনই যোগাযোগ করতে হবে।

* * * *

''এত অবধি যা যা বলেছ সেসব শুনেও কিন্তু তোমার আর অনির্বাণের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হওয়ার কারণটা বুঝতে পারলাম না। মানে তোমার কিছু অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেটা নাহয় মানলাম। কিন্তু তার সঙ্গে তোমাদের বিচ্ছেদের কোনো সম্পর্ক তো খুঁজে পাচ্ছি না।''

কথাটা হচ্ছিল আমার ঘরে বসে। তখন সবে সন্ধে নামছে। কাকার কথামতো আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছি মাধুরীর কাহিনির শেষটুকু জেনে নেওয়ার জন্য।

এখানে কাকার কথাটা বলে নেওয়া আবশ্যক। ইনি আমার নিজের কাকা নন, এমনকি রক্তের সম্পর্কেরও কেউ নন। কাজের সূত্রে আমাদের অফিসে একবার এসেছিলেন ভদ্রলোক, সেই থেকে আলাপ। এই মিষ্টভাষী, সদালাপী, জ্ঞানী ব্রাহ্মণবটুকে আমার প্রথম দর্শনেই বেশ ভালো লেগে যায়। দিনে দিনে সেই আলাপ বাড়তে বাড়তে ঘনিষ্ঠতায় পর্যবসিত হতে দেরি হয়নি বেশি।

ভদ্রলোকের বয়েস তখন ছিল প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি, তাই শ্রদ্ধা দেখিয়ে কাকা বলে ডাকতাম। উনি অবশ্য মৃদু অনুযোগ করেছিলেন সে নিয়ে, ওঁকে দাদা বলে ডাকলেই নাকি ঠিক হত। বলা বাহুল্য সেসব কথায় কান দিইনি।

ভদ্রলোকের বিভিন্ন বিষয়ে ইন্টারেস্ট আছে, সে নিয়ে পড়াশোনাও করেছেন প্রচুর। তবে আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছিল ওঁর তন্ত্রচর্চা। ভদ্রলোক ছিলেন একজন বিশিষ্ট তন্ত্রশাস্ত্রবিদ, ওঁর নিজের ভাষায়, 'প্র্যাকটিসিং তান্ত্রিক'। ওঁকে দেখে অবশ্য দেখে সেসব বোঝার কোনো উপায় নেই। তান্ত্রিক বলতেই যেরকম গেরুয়া পরা, জটাজূটধারী, উগ্র স্বভাবের লোকজনের কথা মাথায় আসে, তাঁদের সঙ্গে এঁর কোনো মিলই নেই। ইনি দিব্য শার্ট-প্যান্ট পরিহিত, মাছেভাতে থাকা নিপাট মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোক। অন্নসংস্থান বলতে ইনশিওরেন্সের দালালি আর আমার মতোই দুষ্প্রাপ্য আয়ুর্বেদিক গাছগাছড়ার খোঁজ করা। গুণের শেষ ছিল না ভদ্রলোকের। খুব ভালো বাঁশি বাজাতে পারতেন, রান্নায় অসামান্য দক্ষতা ছিল আর যেটা সবচেয়ে ভালো পারতেন, সেটা হচ্ছে কোষ্ঠীবিচার। আমি নিজেও ওঁর কাছে প্রচুর শিখেছি এ ব্যাপারে।

কাল আমার কথা শুনেই কাকা বলেছিলেন যে আমার ওপর একটা সাংঘাতিক বিপদ আসতে চলেছে। বিপদটা ঠিক কী, সেটা উনি অকুস্থলে না এলে বুঝতে পারবেন না। তবে আমি যেন আমার পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার আগে একটু অপেক্ষা করে যাই, কাল বিকেলের মধ্যেই উনি তিনসুকিয়া আসার চেষ্টা করছেন। তার আগে আমার একটাই কাজ, আমি যেন মাধুরীর থেকে ওর যাবতীয় কাহিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জেনে নিই।

ফোন রেখে দেওয়ার আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম ওঁকে—

''কেসটা কোনদিকে গড়াচ্ছে কিছু বুঝতে পারছেন কাকা?''

''পারছি বই কি!''

''সে কী? বুঝতে পারছেন? তাহলে সে বিষয়ে আমাকে বলুন কিছু।''

''সময় এলে সবই জানতে পারবে ভাইপো। তোমার উচিত ছিল শিলিগুড়ি ছাড়ার আগে ওই গোলকপুষ্পের পুথিটার ব্যাপারে আমার সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া।''

''সে নাহয় মানছি যে সেখানে আমার একটা ভুল হয়েইছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও...''

''ওহে আয়ুর্বেদাচার্য, গোলকপুষ্প মানে কী?''

''মানে আবার কী, গোল আকারের পুষ্প। কুঁড়িটার আকার ছোট গোলমতো, সে তো দেখেই এলাম।''

কাকা সচরাচর এসব ক্ষেত্রে অট্টহাসি হেসে আমার জ্ঞানের অপ্রতুলতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। কিন্তু সেদিন ভদ্রলোকের স্বর খুব গম্ভীর শোনাল।

''শোনো ভাইপো, সম্পূর্ণ অজান্তে তুমি যেখানে পা দিয়েছ সে বড় বিপজ্জনক ফাঁদ। মুশকিল হচ্ছে এখন সেখান থেকে তুমি চাইলেও বেরিয়ে আসতে পারবে না।''

''কেন? পারব না কেন?''

''কারণ স্বয়ং মদনদেব তাতে বাধা দেবেন।''

ঘোরতর প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলুম। তার আগেই আমাকে থামিয়ে দিলেন কাকা, ''শোনো বাপু, সংসার করিনি তো কী হয়েছে, তাই বলে সাংসারিক জ্ঞান আমার কিছু কম নয়। শুনেছ তো, লালন গেয়ে গেছেন, অমাবস্যায় পূর্ণিমার তিথি, পুরুষের ক্ষয়ের ভীতি।''

ইঙ্গিতটা বুঝতে কষ্ট হল না। কানটা সামান্য গরম হয়ে উঠল। ছি ছি ছি, আমার বলার মধ্যেই এরকম কিছু ইঙ্গিত লুকিয়ে ছিল নাকি?

তবে সে সংশয় দূর হল কাকার পরের কথায়, ''অত কিছু ভেবে লাভ নেই ভাইপো, এ তোমার ভবিতব্যের লিখন। তোমার কুষ্ঠী আমার মুখস্থ। আমি জানতাম যে তোমার জীবনে এই দিনটা আসতে চলেছে। আমার দৃঢ় ধারণা সেটা তুমি নিজেও দেখেছ, কিন্তু লক্ষ করোনি। একটা বিশাল ঝড় আসতে চলেছে তোমার ওপর। সেটা তুমি একা সামলাতে পারবে না। তার জন্য এই শর্মাকে তোমার দরকার। আমাকে ওখানে আসতেই হবে।''

এর পরে আর কথা চলে না। কাকা বললেন, যে করে হোক উনি পরের দিন সকাল নাগাদ তিনসুকিয়া চলে আসবেন। তার মধ্যেই আমি যেন মাধুরীর কেসটা ভালো করে জেনে রাখি।

সেদিন পরাগদের ওখান থেকে যখন বাড়ি ফিরি তখন বেশ দুপুর। কাকিমা জানতেন যে আজ আমি বাড়িতেই খাব। দেখি আমার পছন্দের বোয়াল মাছের ঝাল আর কুমড়োফুলের বড়া রান্না করা হয়েছে। সঙ্গে ঘরে পাতা দই।

মাথা নীচু করে খাচ্ছি, কাকিমা কানের কাছে ফিসফিস করে সতর্ক স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, ''কথা কিছু এগোল বাবা?''

আড়চোখে তাকিয়ে দেখি রান্নাঘরে মাধুরী, বড়া ভাজছে। কাকিমার সতর্কতার কারণ বুঝলাম।

''আপনাকে কিছু বলেছে?''

কাকিমা তড়িৎগতিতে মাধুরীর দিকে একবার তাকিয়েই ফের এদিকস্থ হলেন, গলাটা আরও নীচু করে বললেন, ''না।''

আমিও গলা নামিয়ে খুব সংক্ষেপে জানালাম যে বার্তালাপ শুরু হয়েছে বটে। কিন্তু এখন তিনি বা কাকু এর মধ্যে বরং না ঢুকলেই ভালো। বিশদে কিছু বললাম না আর, কারণ ব্যাপারটা আমি নিজেই ভালো করে বুঝে উঠতে পারিনি।

আড়চোখে দেখলাম প্লেটে আরও কয়েকটা কুমড়োফুলের বড়া নিয়ে মাধুরী এদিকেই আসছে। আমি স্বাভাবিক হলাম। উচ্চকণ্ঠে মাধুরীর রান্নার প্রশংসা করলাম। মেয়েটার গাল দুটো অল্প লাল হল। অল্প হেসে বলল, ''তাও তো আমার দিদিমার হাতের রান্না খাননি।''

''তাই নাকি? তিনি এর থেকেও ভালো রাঁধতেন?''

''ভালো? অসাধারণ বললেও কম বলা হয় বাবা'', এবার জবাব দিলেন কাকিমা, ''আমার মায়ের হাতের রান্না একবার যে খেয়েছে সে জীবনে ভুলতে পারত না। আর শুধু রান্নাবান্না কেন, অনেক কিছুতেই মায়ের হাত একেবারে সোনায় মোড়া ছিল। হোমিওপ্যাথি জানতেন খুব ভালো, অপূর্ব সুন্দর গান গাইতে পারতেন, সেলাই-ফোঁড়াই থেকে শুরু করে বাগান করা, আমার মায়ের সবেতেই আশ্চর্য দক্ষতা ছিল।''

''আরিব্বাস, দিদিমার তো অনেক গুণ ছিল বলতে হবে।''

''সে আর বলতে? তা ছাড়াও মায়ের ছিল দয়ার শরীর। পাড়ায় কার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, টাকার অভাবে কার বাচ্চার পড়াশোনা আটকে আছে, কার শরীর খারাপ, কে মা-বাবাকে দেখছে না, সব কিছু মায়ের নখদর্পণে থাকত। লোকে ভগবানের মতো মানত মাকে। মায়ের নামটিও ছিল তেমনই মানানসই, মহামায়া।''

''আর আমাকে যে খুব ভালোবাসত দিদুন, সে কথা বললে না?'' আদুরে গলায় বলল মাধুরী।

''সে তো বাসতেনই'', আদর করে মেয়ের নাকটা টিপে দিলেন কাকিমা। তারপর আমাকে বললেন, ''বুঝলে বাবা, আমার মেয়েকে প্রাণের থেকেও ভালোবাসতেন আমার মা। দিনরাত কোলে নিয়ে বসে থাকতেন আর মাথায় বুকে হাত বুলোতেন। আমাকে বলতেন, 'ওকে খুব যত্ন করে মানুষ করিস মা, তোর মেয়ে ভৈরবীচিহ্ন নিয়ে জন্মেছে। ও ঈশ্বরকোটির মেয়ে, ও সাধারণ মেয়ে নয়'।''

ভৈরবীচিহ্ন, ঈশ্বরকোটি, এসব শুনে মাথার মধ্যে কিছু একটা টিকটিক করে উঠল। কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই মাধুরীর ফের সেই আদুরে গলা, ''আর ওই যজ্ঞটার কথা বললে না মা?''

''ধুর পাগলি। সেসব কি এখন বলার সময়?'' মেয়ের মাথায় আদরের হাত বুলিয়ে দিলেন কাকিমা।

''কীসের যজ্ঞ? শুনি শুনি'', বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলাম।

''আরে সে এমন কিছু নয়'', সামান্য হাসলেন কাকিমা, ''আমার মা খুব ধার্মিক মানুষ ছিলেন বাবা। যত কাজই থাক, ঈশ্বরচিন্তা করতে ভুলতেন না। কতদিন দেখেছি দিনরাত সংসারের নানা কাজ সামলে রাত্রে ধ্যানে বসতে। মানে ধরো আমি পাশে শুয়ে আছি ঘুমের ভান করে, আর চোখ পিটপিট করে দেখছি মা শিরদাঁড়া সোজা করে পদ্মাসনে বসে ধ্যান করছেন।''

''বাপ রে! এসব তো সাধিকা যোগিনীরা করেন।''

''তা আমার মা কোনো যোগিনীর থেকে কম ছিলেন না বাবা। আর হবে নাই বা কেন, কার মেয়ে সেটা দেখতে হবে তো। আমার দাদামশাই কৃষ্ণশঙ্কর মণ্ডল ছিলেন একজন বিখ্যাত অবধূত, গৃহী তান্ত্রিক। বহু লোকের উপকার করেছেন জীবনে। গোটা পরগনার লোক আমার দাদামশাইকে যেমন ভালোবাসত, তেমনই ভক্তিশ্রদ্ধা করত। এমনও শুনেছি দাদামশাই রাস্তায় বেরোলে নাকি লোকে রাস্তার ধারে সরে যেত, যাতে ওঁর ছায়ার ওপর কারও পা না পড়ে, এমনই সম্মান পেতেন মণ্ডলমশাই। আমার মা তেমনই সাধকের বেটি বটে!

তা আমার মা যখন মারা যান, তখন মাধুর বয়েস আট। একদিন হঠাৎ আমাকে ডেকে বললেন, 'আমার আর বেশিদিন নেই রে শর্মিলা, সামনের কৌশিকী অমাবস্যায় আমি দেহ রাখব। তোরা যজ্ঞের আয়োজন কর।' আমরা তো অবাক। তখনও মায়ের চুল সব পাকেনি, দিব্যি কর্মঠ আছেন। কিন্তু তাঁর কথা অমান্য করার উপায় নেই, যজ্ঞের আয়োজন করতেই হল।''

''কীসের যজ্ঞ?'' আমার খাওয়ার গতি স্তব্ধ হয়ে এল।

''সে বলতে পারব না বাবা। তিনি যজ্ঞের আয়োজন করলেন কৌশিকী অমাবস্যার ঠিক আগের রাতে। তার আগেই বাড়ির সব্বাইকে বলা হয়েছিল সে রাতটা বাইরে অন্য কোথাও কাটাতে, বাড়িতে শুধু আমি, মা আর মাধু। রাত বারোটার সময় মা হোমে বসলেন। যেসব বিচিত্র জিনিস দিয়ে সে যজ্ঞে আহুতি দিলেন মা, তা দেখে তো আমার বুক ভয়ে দুরুদুরু। সে যজ্ঞ চলল ভোররাত অবধি। ততক্ষণ যজ্ঞস্থল ছেড়ে মা আমাদের দুজনকে উঠতে অবধি দেননি। হোম শেষ হওয়ার পর মা যজ্ঞকুণ্ডে জল ছিটিয়ে মাধুকে বললেন, 'ছাইয়ের ভেতরে হাত দে মেয়ে'।''

''তারপর?''

এবার মাধুরীর গলা, ''আমি তো ছাইয়ের ভেতরে হাত দিয়ে হাতড়াচ্ছি। দিদুন আমার দিকে উদ্বিগ্নভাবে চেয়ে আছেন। এমন সময় নরম নরম গোলমতো কী একটা যেন আমার হাতে ঠেকল। দিদুনকে সেটা বলতেই দিদুন বলল, 'এক্ষুনি ওটা বার করে আন মা।' আমি বার করতেই দিদুন ওটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল প্রায়।''

''সেইদিন ভোরে মা একটা মাদুলি দিয়ে যান ওকে সবসময় পরার জন্য। আর সেইদিনই সন্ধে আটটা নাগাদ মা মারা যান।''

আবার খাওয়াতে মনোনিবেশ করলাম। এরকম গল্প জীবনে কম শুনিনি। বাংলার হাটেবাজারে কান পাতলেই এমন গল্প হাজার একটা শোনা যায়। একটা কুমড়োফুলের বড়া মুখে দিয়ে বেশ আয়েশ করে বললাম, ''আরও একজন মস্ত বড় সাধক তিনসুকিয়া আসছেন কাল বিকেল নাগাদ, এই মাধুরীর ব্যাপারেই আমাকে একটু সাহায্য করতে, জানেন তো?''

''কে বাবা? কে আসছেন?'' সাধক শুনেই কাকিমা উত্তেজিত হয়ে পড়লেন।

খেতে খেতে আমি কাকার আসার কথা বললাম। কাকিমা শুনে সবিশেষ সন্তুষ্ট হলেন, তাঁর মেয়ের সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে আরও একজন এক্সপার্ট যোগ দিচ্ছেন বলে। মাধুরী কিছু বলল না বটে, তবে

হাবেভাবে বোঝা গেল যে তার বিশেষ আপত্তি নেই। গত কয়েকদিনের কাঠিন্য এখন অনেকটাই উধাও।

খেয়েদেয়ে ঘরে গিয়ে একটু গড়িয়ে নিতে নিতেই বেলা বয়ে গিয়ে বিকেল। ঘর থেকে উঠে বাইরে বেরিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। চারিদিকে দিব্যি ঝিরিঝিরি বাতাস বইছে, কাকুর বাংলোর সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তিনসুকিয়া টাউনের শান্ত অলস বিকেল। কলতলার দিক থেকে শিউলিফুলের হালকা সুবাস ভেসে আসছে। মাথা উঁচু করে একটা ধোঁয়ার রিং ছাড়লাম। আকাশে ঝকঝকে সাদা মেঘের দল। কোথায় ভেসে যাচ্ছে কে জানে?

সিগারেট শেষ করতে না করতেই কানের কাছে একটা মৃদু ঘসঘস আওয়াজ শুনলাম। চোখ নামিয়ে দেখি মাধুরী। পরে এসেছে একটা খুব সাধারণ মেখলা শাড়ি। জমির রং সাদা, পাড় গাঢ় সবুজ রং-এর। হঠাৎ করে আমার কেমন যেন মনে হল উজনি আসামের এই উন্মুক্ত প্রকৃতির যিনি অধীশ্বরী, সেই সাক্ষাৎ বনদেবীই যেন নেমে এসেছেন আমার সামনে। এই প্রথম লক্ষ করলাম মাধুরীর সুঠাম সুডৌল শরীর, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ত্বক, পদ্মকাণ্ডের মতো ফর্সা দুটি হাত আর গভীর কালো আঁখি দুখানি। মুখে একটা হালকা হাসির আভাস। এই প্রথম লক্ষ করলাম যে হাসলে মাধুরীর গজদন্ত দুটি সামান্য উন্মুক্ত হয়, আর তাতে ভারী সুন্দর দেখায় তাকে।

মনটাকে শক্ত করলাম। অনেক দিন ধ্যান প্রাণায়াম এসব হয় না, তাই চিত্ত কুপিত হয়েছে। নইলে এসব উদ্ভট চিন্তা মাথায় আসবে কেন?

মাধুরীকে নিয়ে ঘরের ভেতরে এসে বসলাম। তারপর সেই প্রশ্নটা করলাম, যেটার উল্লেখ প্রথমেই করেছি।

মাধুরী খানিকটা বিবর্ণ হয়ে গেল যেন। একটু আগের সেই ঝলমলে ভাবটা উধাও। মাথা নীচু করে কী যেন ভাবল একটা। তারপর বলতে লাগল, ''এইখান থেকে যে কী হল দাদা, সে আমি এখনও বুঝিনি। তবে পুরো বিষয়টা মনে পড়লেই গা ঘিনঘিন করে ওঠে।

ওদের বাড়িতে যখন পৌঁছোই, তখন দুপুর হবে হবে করছে। দরজায় দাঁড়িয়ে সবে বেল বাজিয়েছি কি বাজাইনি, দরজাটা খুলে গেল। দেখি দিভাই বেরিয়ে এসেছেন। কোথাও যেন একটা যাচ্ছিলেন। আমাকে দেখে একটু চমকে গেলেন, বললেন, 'এ কী মাধু, মুখ-চোখ এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন? শরীর ভালো তো?'

দিভাইকে প্রণাম করে ঘরে গিয়ে উঠলাম। যাদবকাকু লাগেজ পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেলেন। অনির্বাণ ভেতরেই ছিল, সেও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল।

দুজনকে পুরো ঘটনাটা বললাম। জ্বরের কথা, স্বপ্নের কথা, ভোরের দিকে হঠাৎ করে জ্বর ছেড়ে যাওয়া, সবই বললাম। দিভাই মাথায় হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। অনির্বাণ শুনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল ডাক্তার দেখানোর জন্য। আমিই বারণ করলাম। বললাম যে বিকেল বা সন্ধের দিকে দেখালেও হবে।

সেদিন রাত্রে খাওয়াদাওয়া করে শুতে যাব, এমন সময় দিভাই ঘরে এলেন। ব্যস্তসমস্ত ভাবে বললেন, 'মাধু, তোকে যে ঠাকুরের মূর্তিটা দিয়েছিলাম, ওটা কোথায়?'

মূর্তিটা নীচে আমাদের আলমারিতে রেখে দিয়েছিলাম। শুনে দিভাই ভারী রাগ করলেন, বললেন, 'ও কি ঘর সাজাবার জিনিস? সঙ্গে রাখতে হয়। ওইজন্যই তো তোর এত অসুখবিসুখ! এক্ষুনি নিয়ে আয় ওটাকে, মাথার দিকে ওই কুলুঙ্গির মধ্যে রাখ।'

আমি তাই করলাম। শুধু লক্ষ করলাম যে মূর্তির গায়ে সিঁদুরের একটা নতুন পোঁচ। আমার কেমন যেন কৌতূহল হল, কোন দেবীর মূর্তি এটা?

একটু একটু করে সিঁদুরের প্রলেপ খুঁটে খুঁটে তুলে ফেললাম। মূর্তিটা একটু অদ্ভুত, কোমর থেকে ওপরের দিকটা সাপের মতো, তার পাঁচটা মাথা। নীচের দিকটা কোনো মহিলার। দেখে মনে হল মনসার মতো কোনো দেবীর মূর্তি। ভাবলাম হবেও কেউ, হয়তো ওদের পারিবারিক দেবতা।

সেদিন রাতে বেশ কিছু ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্ন দেখলাম, তবে তার কোনোটাই ভয়ংকর কিছু না। তবে প্রবলেম শুরু হল পরের দিন সকাল থেকে।

সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসে অনির্বাণের সঙ্গে একচোট ঝগড়া হয়ে গেল। অথচ তেমন কিছু ছিল উপলক্ষ্য ছিল না, নিতান্তই মামুলি ব্যাপার। অথচ ঝগড়া করতে করতে দুম করে আমার মাথাটা এমন গরম হয়ে গেল যে, এক টান মেরে খাবারদাবার সব ফেলে দিয়ে দুম দুম করে উপরের ঘরে চলে এলাম।

খানিক পরে মাথাটা ঠান্ডা হতে খুব অনুতপ্ত বোধ হতে লাগল। এমনিতে আমি খুব ঠান্ডা মাথার মেয়ে। অমন একটা তুচ্ছ কারণে অতটা রেগে যাওয়া মোটেও উচিত হয়নি। নীচে গিয়ে সব গুছিয়েগাছিয়ে অনির্বাণকে সরি বলে এলাম।

কিন্তু সেখানে গল্পের শেষ না, শুরু!

লক্ষ করতে শুরু করলাম যে দিভাই আর অনির্বাণের মধ্যে একটা অদ্ভুত ঘনিষ্ঠতা আছে। একটু অস্বাভাবিক।''

''অস্বাভাবিক বলতে?'' ব্যাপারটা পরিষ্কার হল না আমার কাছে।

''কীরকম অস্বাভাবিক সেটা আপনাকে বোঝানো একটু মুশকিল।'' একটু অস্বস্তির সঙ্গে নড়েচড়ে বসল মাধুরী, ''ভাইবোনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা থাকবে সে আর এমন কী, তাই না? আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু দু'দিনের মধ্যে বুঝলাম যে ব্যাপারটার মধ্যে একটা অ্যাবনর্ম্যাল কিছু আছে। আমার চোখে ব্যাপারটা একটু কেমন জানি অন্যরকম মনে হতে লাগল।''

''কীরকম?'' আমি একটু সামনের দিকে ঝুঁকে এলাম।

''ওটা আপনাকে বোঝানো একটু মুশকিল দাদা। আমরা মেয়েরা বুঝতে পারি। চোখের ইশারায়, দৃষ্টিতে, অনির গায়ে মাথায় দিভাইয়ের হাতের ছোঁয়ায়... মোটমাট আমার মাথার মধ্যে কে যেন বলতে লাগল ব্যাপারটা খুব একটা স্বাভাবিক না।

এদিকে শুরু হল অন্য সমস্যা। রোজই আমাদের মধ্যে কথায় কথায় তুমুল অশান্তি আর ঝামেলা শুরু। প্রতি কথায় বাকবিতণ্ডা হতে হতে সে প্রায় মারামারি কাটাকাটি হওয়ার মতো অবস্থা। অনির্বাণ খুব ঠান্ডা মাথার লোক, তাকে আমি কোনোদিন রাগতে দেখিনি। সেও গলা উঁচিয়ে সমানে ঝগড়া করে যেতে লাগল। দিভাই এক-দুবার শান্ত করতে এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন।

সেদিন দুপুরে সিঁদুর পরতে গিয়ে ফের সেই ডাক শুনলাম, তবে আগের থেকে অনেক ক্ষীণ। তখন আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেকে চিনতেই পারছিলাম না। স্নান করে আসা সত্ত্বেও দেখি মাথার চুলগুলো হাওয়ায় সাপের মতো উড়ছে। চেহারার মধ্যে একটা ক্রুদ্ধ রুক্ষ ভাব। নিজেকে কখনও ওই চেহারায় আগে দেখিনি।

সিঁদুর পরে একটু মাথাটা ঠান্ডা করে ভাবার চেষ্টা করলাম যে কেন আমি এরকম করছি। যে মানুষটাকে আমি নিজে ভালোবেসে বিয়ে করেছি, তার সঙ্গে এত অশান্তি কেন? ভেবে দেখতে গেলে ঝগড়ার কারণগুলোও কিন্তু খুবই তুচ্ছ। যেমন নুনদানিটা কেন ওখানে রাখা আছে, কাঁটাচামচ এগিয়ে দেওয়ার সময় ও কেন মাথার দিকটা ধরে এগিয়ে দিল, বাথরুমে জল পড়ে আছে কেন, এইসব। এসব সামান্য, অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া করার কথা আমি ভাবতেও পারি না। অথচ ঠিক সেটাই ঘটছে।

সেদিন থেকে দিভাইয়ের আচরণও আমার কাছে আরও বিসদৃশ ঠেকতে লাগল। অনির মুখে খাবার লেগে আছে, উনি বুকের আঁচল খসিয়ে মুখ মুছে দিচ্ছেন। ভাই ঝগড়া করতে করতে মুখ ভার করছে, উনি ভাইয়ের মাথাটা বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন।''

এতটা বলেই একটু সংকুচিত হয়ে পড়ল মাধুরী, ''দাদা, আপনি কি আমাকে পারভার্ট বলে ভাবছেন? ডার্টি মাইন্ড?''

শাস্ত্রে বলে স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম ভগবানেরও অগম্য। যে মেয়েটাকে আমি দু'দিনের বেশি চিনি না তার চারিত্রিক গুণাবলির ব্যাপারে এখনই কোনো সার্টিফিকেট দেওয়া ঠিক হবে না ভেবে চুপ করে রইলাম।

"বিকেলের দিকে ভাবলাম একটু বেড়িয়ে আসি, বাড়ির গুমোট ভাবটা কাটবে। একটা রিকশা করে অনির্বাণকে নিয়ে ব্রহ্মপুত্রের ধারে হাওয়া খেতে গেলাম। লক্ষ করলাম রিকশাতে অনির্বাণ কেমন যেন কাঠ হয়ে বসে আছে। আমার খুব খারাপ লাগল, ভাবলাম হয়তো সকালের ঝগড়াঝাঁটির জের। এক-দুবার ওর হাতটা ধরার চেষ্টা করলাম, কোনো সাড়া পেলাম না।

সেদিন বেড়ানোটা মোটেও সুখের হয়নি। ফেরার পথে রাস্তাতেই একবার কথা কাটাকাটি হয়ে গেল, তাও রিকশাওয়ালার ভাড়া সংক্রান্ত তুচ্ছ একটা বিষয়ে। ফিরে এসে খানিকক্ষণ গোঁজ হয়ে বসে রইলাম দুজনেই। সে যাই হোক, খেয়েদেয়ে রাতে শুতে গেছি, এমন সময় মনে হল সারা ঘরে কেমন যেন একটা অদ্ভুত গন্ধ।"

"কীসের গন্ধ?" সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলাম।

"কেমন যেন ভিজে কাঠ পোড়ার গন্ধ। একটু ভারী, ভ্যাপসা, দম আটকে আসার মতো একটা গন্ধ।"

আশা করছিলাম এই উত্তরটাই আসবে। তাই বিশেষ চমকালাম না।

"ঘরে ঢুকে ফ্যান চালিয়েও যখন গন্ধটা গেল না, তখন চেষ্টা করলাম গন্ধটা কোথা থেকে আসছে সেটা খোঁজার। আঁতিপাঁতি করে মেঝে, খাটের তলা, আলমারির পেছন ইত্যাদি খুঁজেও তার হদিস পেলাম না। শেষমেশ ঘরের চারিধারে খুঁজতে গিয়ে বুঝলাম যে গন্ধটা আসছে কুলুঙ্গি থেকে, যেখানে মূর্তিটা আছে।

কেন জানি না ওটা আর নেড়েঘেঁটে দেখতে ইচ্ছে করল না। আমি মশারি টাঙিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। তখনও অনির্বাণ শুতে আসেনি। কিছুক্ষণ মনে মনে গজগজ করলাম, নবাবপুত্তুরের এমন কী অভিমান যে এখনও শুতে আসতে পারছেন না?

খানিকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করার পর উঠে বসলাম। হাতঘড়িটা মাথার কাছেই ছিল, দেখি প্রায় বারোটা বাজে। এখনও শুতে এল না লোকটা?

ও বাড়ির দোতলায় একটাই ঘর, আমাদের। ভাবলাম বাবু বুঝি অভিমান করে ছাদে হাওয়া খেতে গেছেন। বিছানা থেকে নেমে দেখি না, তা নয়। দোতলাটা ফাঁকা। ছাদে যাওয়ার দরজা তালাবন্ধ। একতলায় দিভাইয়ের ঘরে আলো জ্বলছে। সেখান থেকে কথাবার্তার মৃদু আওয়াজ ভেসে আসছে। একটু পরেই দেখি অনির্বাণ বেরিয়ে আসছে। আমি একটু সরে এলাম। দিভাইয়ের ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

অনির্বাণ শুতে এলে আমি আর দেরি হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম না, এমনই অভিমান হয়েছিল ওর ওপর। হোক যতই ঝগড়াঝাঁটি, তাই বলে মাঝরাত অবধি সেসব দিদিকে বলতে হবে?

পরের তিন-চারটে দিন এইভাবেই গেল। সকাল থেকে উঠেই অশান্তি, ঝগড়া শুরু। কেউ কারও সঙ্গে বিশেষ কারণ ছাড়া কথাই বলছি না। দিভাইও চেষ্টা করে করে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। সকালে ঠুকঠাক দিয়ে শুরু হয়, বিকেলের পর মারাত্মক আকার নেয়। নতুন বউকে দেখতে আসা প্রতিবেশীদের ভিড়ও পাতলা হয়ে এসেছে। একদিন শুনলাম কাজের লোক দিভাইকে আড়ালে বলছে, পাড়ায় বলাবলি শুরু হয়েছে, এ কোন খাণ্ডারনি মেয়ে বউ হয়ে এসেছে এ পাড়ায়? শুনে আমার মেজাজ একেবারে সপ্তমে। কাজের মেয়েটিকে ডেকে যাচ্ছেতাই করে বললাম। সে নিয়ে আবার একপ্রস্থ অশান্তি।

এদিকে অনির্বাণ রোজই মাঝরাত পার করে শুতে আসছে। খাওয়ার পর মাঝরাত অবধি ও দিভাইয়ের ঘরে কাটায়, ঘরের দরজা বন্ধ থাকে। আমার মেজাজ যাচ্ছে আরও খিঁচড়ে। সবে বিয়ে হয়েছে, হানিমুন কাটিয়ে ফিরেছি। কোথায় স্বামীসঙ্গ উপভোগ করব, তার বদলে তাঁর আবার দিদির প্রতি এতই আঠা যে মাঝরাত অবধি আড্ডা না মেরে উনি শুতে আসতে পারছেন না!"

এইখানে এসে মাধুরীকে থামালাম আমি। এই জায়গাটা আমার পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

''একটা কথা বলো তো মাধুরী, খোলাখুলি জিজ্ঞেস করছি। তোমাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক কেমন ছিল?''

একটু সোজা হয়ে বসল মাধুরী।

''দেখুন দাদা, বলতে যখন বসেছি, তখন সবই বলব। তা ছাড়া ডাক্তার আর উকিলের কাছে এমনিতেও কিছু লুকোতে নেই। আমাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক বিয়ের আগেও এক-দুবার হয়েছে। সেদিক দিয়ে আমার বা অনির, কারোরই কোনো অসুবিধা ছিল না। বরং এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে চমৎকার বোঝাপড়া ছিল। ভুটানের হানিমুনের দিনগুলোতেও আমরা চুটিয়ে একে অপরের সঙ্গ উপভোগ করেছি।

কিন্তু যেদিন ওদের বাড়িতে ফিরে গেলাম, সেদিন থেকেই মনে হল ওর প্রতি সেই শারীরিক টানটা আর অনুভব করছি না। হঠাৎ করেই মনে হল ও একটু বেশি নরমসরম, মেয়েলি গোছের, সেই শক্তপোক্ত পুরুষালি ব্যাপারটা নেই। তার ওপর বেঁটে, মাথায় হালকা টাক। আমার কাছে ও আর সেই ভালোবাসার অনির্বাণ রইল না। ওর শারীরিক খুঁতগুলোই আমার কাছে বড় হয়ে দেখা দিতে লাগল।''

''কিন্তু তাতে করে কী...''

''হ্যাঁ দাদা, তাতে করেই কেমন যেন আমার মনে হতে লাগল যে এই লোকটা আমাকে রাত্রে ছোঁবে? ম্যা গো! প্রথম দিন রাতে আমার কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করতেই কড়া গলায় ওকে বলে দিই আমাকে যেন একদম ডিস্টার্ব না করে। ও আর চেষ্টা করেনি। অথচ প্রতিরাতে ও যখন দিভাইয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে শুতে আসত, একটা নোংরা ঈর্ষায় আমার বুকটা জ্বলে যেত। শুধু মনে হত, এই যৌবন নিয়ে আমি বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছি, আর উনি দিদির ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে এমন কী আড্ডা মারছেন শুনি? অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, যে মুহূর্তে লোকটা আমার ঘরে ঢুকত তক্ষুনি লোকটাকে আমি ঘেন্না করতে শুরু করতাম।''

''সে আবার কী?'' মনে হল হয়তো ঠিক শুনলাম না আমি, ''ঘেন্না করবে কেন? এই যে বললে ঈর্ষায়..''

''ওটাই তো প্রবলেম দাদা'', একটা তিক্ত অথচ বিষণ্ণ হাসি খেলে গেল মাধুরীর কমনীয় ঠোঁটদুটি ছুঁয়ে। ''যতক্ষণ ও আমার চোখের বাইরে থাকত, ততক্ষণ মনে হত কোথায় গেল লোকটা? খুব অভিমান হত। অথচ ও আমার সামনে এলেই অদ্ভুতভাবে ওর প্রতি একটা অন্ধ রাগ জেগে উঠত বুকের মধ্যে। মনে হত বোমার মতো ফেটে পড়ে ছারখার করে দিই লোকটাকে। আমার সঙ্গেই পুড়ে মরে যাক ও।''

জানি না, শেষ কথাটা শুনে আমার বুকের মধ্যে কোথাও অতি সূক্ষ্ম কী একটা টং করে এসে বিঁধল। চুপ করে রইলাম। ঘরের মধ্যে অখণ্ড নীরবতা। দেওয়ালে ঝোলানো ক্যালেন্ডারটা হাওয়ায় অল্প অল্প উড়ছিল। সেখান থেকে একটা ঠকঠক আওয়াজ আসছিল শুধু।

মাধুরী একটু থেমে ফের বলতে লাগল, ''দিনে দিনে এই অশান্তি বেড়েই চলল। প্রতিপদে ওর ভুলগুলো নজরে পড়তে লাগল। আর আমার মনে হতে লাগল এই ভুলগুলো ও করবে কেন? কী অধিকার আছে ওর ভুল করার? আমি ওকে সেগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে লাগলাম। ও কিছু বললেই খুব রূঢ় ভাষায় জবাব দিতে থাকলাম। দিভাইও এক-দুবার মাঝখানে কিছু বলতে এসে অপমানিত হলেন। ওই মহিলাকে আমার আর সহ্য হচ্ছিল না। এরই মাঝে একদিন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল।''

''কী সেটা?''

মাথা নীচু করে রইল মাধুরী। বুঝলাম খুব জটিল কিছু বলতে চলেছে আমাকে।

''যেদিন সবকিছু গুছিয়ে এ বাড়িতে চলে আসি, তার আগের দিনের ঘটনা। রাতের খাওয়ার শেষে আমি ওপরে এসে শুয়েছি। একটু তন্দ্রামতন এসেছে কি আসেনি, এমন সময় কানের কাছে ফের শুনতে পেলাম সেই ডাক, 'আমাদের বারণ শোন মেয়ে, ও সিঁদুর পরিসনি, ও সিঁদুরে বিষ আছে, ও সিঁদুর মহা সর্বনাশী...' আমি শুনতে শুনতে যেন আরও গভীর ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যেতে লাগলাম। আমার মনে হতে লাগল আমার শরীর যেন অবশ হয়ে আসছে। হাতে-পায়ে একদম সাড় নেই। অথচ হুঁশ কিন্তু আবছা হলেও আছে।

মড়ার মতো খাটে শুয়ে আছি, এমন সময় মনে হল কে যেন ধীরপায়ে দরজা খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। একইসঙ্গে অদ্ভুতভাবে বন্ধ হয়ে গেল মাথার দিকের জানলাটাও। ঘরের মধ্যে একটা গা ছমছমে অন্ধকার। আমার হঠাৎ করে খুব শীত করতে লাগল।

প্রথমে ভাবলাম বুঝি অনির্বাণই এসেছে বাইরে থেকে। তার পরমুহূর্তেই ভুল ভেঙে গেল। ওর পায়ের শব্দ আমি চিনি। কিন্তু এখন যে ঢুকেছে তার হাঁটাচলার কোনো শব্দ নেই।

বুঝতে পারলাম যে লোকটা, সে যেই হোক না কেন, নিঃশব্দে আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

আমার গা-টা কেমন যেন একটু শিউরে উঠল প্রথমে। ঘরের ভেতর সবকিছু একদম চুপচাপ, পাখা ঘোরার আওয়াজটাও শোনা যাচ্ছে না। সেই স্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে দেখলাম যে লোকটা আমার ওপর ঝুঁকে এসে আমাকে দেখছে ভালো করে। সঙ্গে সঙ্গে একটা নোংরা পচা বিচ্ছিরি গন্ধে আমার নাক বন্ধ হয়ে এল প্রায়। আমি মুখটা সরিয়ে নিতে চাইলাম, কিন্তু ঘাড়টা স্টিফ হয়ে রইল।''

আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল প্রায়। ''কী সাংঘাতিক! তারপর?''

''তারপর লোকটা একহাতে আমার আঁচলটা টেনে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর দুহাতে আমার ব্লাউজ ছিঁড়ে ফেলল।''

ঘরের মধ্যে কোনো শব্দ নেই, দেওয়ালঘড়ির টিকটক ছাড়া। আমি ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি। আমার রক্ত গরম হয়ে উঠেছে। হাতের মুঠো শক্ত।

ভাবলেশহীন ভাবে বলে যেতে লাগল মাধুরী, ''আমি ছিটকে উঠতে গিয়েও পারলাম না। আমার শরীর শক্ত হয়ে থাকল কাঠের মতো। লোকটা ধীরেসুস্থে আমার ওপর ঝুঁকে এল। আর তখনই ওর চোখদুটো নজরে এল আমার। বাপস রে!'' চেয়ারে বসেই থরোথরো করে কেঁপে উঠল মাধুরী।

প্রবল উত্তেজনায় ঝুঁকে এলাম আমি, ''কেমন দেখতে লোকটাকে?''

''আমার দু'চোখ বন্ধ হয়ে এসেছে, সেটা প্রবল ভয়ে না ঘেন্নায় বলতে পারব না, তার মধ্যেই দেখলাম যে লোকটার গায়ের রং কালো। কুচকুচে কালো, কয়লার ওপর আলকাতরা লেপে দেওয়ার মতো কালো। অত কালো মানুষ আমি জন্মে দেখিনি।''

''তুমি ঠিক দেখেছ?''

''একদম।'' বলতে বলতে হাঁপাচ্ছিল মাধুরী। ওর দু'চোখ বিস্ফারিত, ফর্সা চোখমুখ লাল হয়ে এসেছে। নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে শিশিরের মতো। একটু ঝুঁকে এসেছে মেয়েটা, বুকের আঁচল সরে গেছে অনেকখানি। শঙ্খের মতো সাদা স্তনবিভাজিকাটি আমার লোভী চোখের সামনে উন্মুক্ত। আমি দ্রুত চোখ সরিয়ে নিলাম।

''তারপর লোকটা আমার শাড়িটা সায়াসুদ্ধু কোমরের ওপর তুলে দিল। প্যান্টিটা খুলে নামিয়ে দিল গোড়ালি অবধি। তারপর আমার ওপর চড়ে বসল।

আমি আতঙ্কে শিউরে উঠলাম, বুঝতে পারলাম যে লোকটা কী করতে চাইছে। কিন্তু আমি অসহায়, আমার চৈতন্য আছে সাড় নেই, বোধ আছে কিন্তু শক্তি নেই। অসহায়, নিষ্ফল আক্রোশে আমার সমস্ত শরীর ফেটে পড়তে চাইছে, কিন্তু আমি পারছি না।

লোকটা অতি ধীরে আমার সারা শরীর ঘাঁটতে লাগল। ঘেন্নায়, কষ্টে আর অসহায়তায় আমার সমস্ত শরীর গুলিয়ে উঠল। আমার সমস্ত শরীর মোচড়াতে লাগল। মনে হল এক্ষুনি, এই মুহূর্তে আমি মরে যাচ্ছি না কেন।

তারপর লোকটা আমার ওপর ঝুঁকে এল। আমার চুলের মুঠিটা ধরে আমার মুখটা ওর দিকে ফেরাল।''

দেখি মাধুরীর সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে ঘামে। চোখদুটো বিস্ফারিত, সমস্ত মুখ লাল, হাত-পা থরথরিয়ে কাঁপছে। খেয়াল করলাম আমার বুকের মধ্যেও একটা বন্য ক্রোধ হিংস্র অজগরের মতো মাথা তুলছে।

নিজের নখগুলো ধারালো হয়ে কেটে বসছে নিজেরই চামড়ার ওপর। কানের দু'পাশ দিয়ে আগুনের হলকা বইছে যেন।

"তারপর কী হল মাধুরী?"

আমার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকাল মাধুরী। সেই ভয়াবহ উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি আমি জীবনে ভুলব না।

"দেখলাম দু'জোড়া বড় বড় হলদেটে চোখ আমার দিকে তাকিয়ে। আর চোখের মণিদুটো লাল, টকটকে লাল।"

নিজের বুকের ধকধক শব্দটাও পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলাম। মনে হল হৃৎপিণ্ডটা যেন আমার গলায় উঠে আসবে।

"লোকটা সেই গনগনে লাল চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে। তাতে ঘেন্না, রাগ, নিষ্ঠুরতা পেরিয়েও যেটা জেগে আছে সেটা হচ্ছে লোভ। নারীশরীরের প্রতি সীমাহীন লোভ। পুরুষমানুষের ওই দৃষ্টি আমরা মেয়েরা জন্ম থেকেই চিনি। কিন্তু সেই হাড় হিম করা আতঙ্কের মধ্যেও কিন্তু একটা জিনিস আমি লক্ষ করতে ভুলিনি দাদা।"

"কী সেটা?"

"লোকটার সারা শরীরে চামড়া নেই। তার জায়গায় যেটা রয়েছে সেটা পালক। পাখির পালক।"

ঘরের মধ্যে গাঢ় আর টানটান নিঃশব্দ উদ্বেগ। সময় যেন সন্ধে পেরিয়ে রাত হওয়ার দিকে গুটিগুটি এগোতে গিয়ে এই ঘরে এসে ধরা পড়ে গেছে। ঘরের বালবের আলোটা হঠাৎ করেই একটু স্তিমিত হয়ে এল।

"লোকটা নিজেকে আমার ভেতরে সজোরে ঢোকাতে যাবে, আমার সমস্ত স্নায়ু রাগে ঘেন্নায় আর আতঙ্কে যেন ফেটে যাওয়ার মুখে, ঠিক সেই সময়ই কোথা থেকে যেন ঘরের মধ্যে একটা আলোর রেখা এসে পড়ল। লোকটা থেমে গেল একটু, আর কে যেন সশব্দে লাথি মেরে আমার ঘরের দরজাটা খুলে দিল। একঝলক দামাল দমকা হাওয়া ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর। সেই হাওয়া আর আলোর ঢেউতে চঞ্চল হয়ে উঠল লোকটা।

যতটা সম্ভব ঘাড় বেঁকিয়ে দরজার দিকে তাকালাম আমি। অতি কষ্টে মাথাটা তুলে দেখলাম দরজার সামনে এক মহিলার সিল্যুয়েট। সম্ভবত বৃদ্ধা, কারণ সামান্য সামনের দিকে ঝুঁকে আছেন তিনি, হাতে একটা লাঠি। মাথার চুল উড়ছে শনের মতো। ঘরের মধ্যে একটু এগিয়ে এসে খুব ক্রুদ্ধ গলায় কী যেন একটা বললেন লোকটার উদ্দেশে। ভাষাটা অজানা। লোকটা সেই শুনে একবার পেছনে ফিরে তাকাল। তারপর তড়িঘড়ি উঠে এগোল জানালার দিকে। তারপর জানলা খুলে ঝাঁপ মারল বাইরে।"

"তারপর?"

"তারপর আর কিছু মনে নেই দাদা। আমার হুঁশ ছিল না।"

উঠে গিয়ে জানলাটা খুলে দিলাম। পাখাটা বন্ধ ছিল, এক পয়েন্টে চালিয়ে দিলাম।

ঘরের মধ্যে কোনো শব্দ নেই। আমার ঘরে একটা দেওয়ালঘড়ি আছে। সেটার দিকে তাকাচ্ছি ঘন ঘন। শিলিগুড়ি থেকে বিকেলের বাস বা ট্রেন তিনসুকিয়া আসতে কত সময় নেয় যেন?

"তারপর জানি না কতক্ষণ পর কোনোমতে উঠে বসলাম খাটের ওপর। প্রথমে ভেবেছিলাম দুঃস্বপ্ন দেখছি বুঝি। তারপর নিজের হাল দেখে বুঝলাম, না, ওটা দুঃস্বপ্ন ছিল না।

কোনোমতে নিজেকে গুছিয়ে উঠে বসলাম। তখনও অনি আসেনি ঘরে। ওকে যে ডাকব, সেই জোরটুকুও গলায় ছিল না আমার। পাশে একটা জলের জগ ছিল। একটুখানি জল নিজের মাথায় দিলাম, খানিকটা খেলাম। সামান্য ধাতস্থ হয়ে ভাবলাম একবার নীচে যাই।

কোনোমতে একটু একটু করে সিঁড়ির রেলিং ধরে নামছি, দেখি দিভাইয়ের ঘরের দরজা আজ অন্যদিনের মতো বন্ধ নয়, খোলা। ঘরের ভেতর থেকে একটা নীল আলো বাইরে ডাইনিং রুমের মেঝেয় পড়ছে। আর

সেই আলোতে দেখলাম...''

থেমে গেল মেয়েটা।

''কী দেখলে মাধুরী?''

''দেখলাম...দেখলাম...ওই নীল আলোতে মেঝেতে দুটো মানুষের ছায়া এসে পড়েছে। আর ওরা...ওরা যেটা করছে, সেটা...সেটা সেক্স ছাড়া আর কিছু না!''

আমার দিকে বোবা চোখে তাকিয়ে রইল মেয়েটা। বুঝলাম, নিজের চোখে যেটা দেখেছে সেটা ও এখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না!

''এবারে আপনিই বলুন দাদা, নিজের বিয়ে করা বরকে তার নিজের দিদির সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করতে দেখার পরেও কি ও বাড়িতে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল? আমি বাড়িতে এসে মা-বাবাকে কী বলতাম? বলতাম যে আমার বর তার দিদির সঙ্গে শোয়? বলতাম যে সিঁদুর পরতে গেলেই আমি মাথার মধ্যে অদ্ভুত সব স্বর শুনি? বলতাম যে একটা সারা গায়ে পাখির পালকওয়ালা লোক আমাকে রেপ করতে এসেছিল? আমার মা-বাবা আমাকে পাগল ভাবত না?''

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। এই মুহূর্তে একটা সিগারেট না খেলে আমার মাথাটা খুলবে না। মাথাটা অসাড় হয়ে গেছে। এমনিতেও আমি আর কিছু শুনতে চাই না, যতক্ষণ না কাকা এসে পৌঁছোচ্ছে।

বাইরে এসে সিগারেট ধরিয়ে নিশ্চুপে টানতে লাগলাম। মাধুরী আমার ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। আকাশের বেশ খানিকটা মেঘে ঢাকা। চারিদিকে একটা অস্বাভাবিক দম বন্ধ করা আবহাওয়া। দিন দুয়েকের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে মনে হয়।

সিগারেট ফেলে চলে আসছি, এমন সময় কোথাও কিছু নেই হঠাৎ করে আমার ঘাড়ের রোঁয়াগুলো দাঁড়িয়ে গেল। মনে হল কলতলার ওপার থেকে কে আমাকে দেখছে। ঘুরে দাঁড়াতেই মনে হল সাদা কাপড় পরা একটা অবয়ব ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি তাকাতেই স্যাঁৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায়।

প্রবল চিন্তা নিয়ে ঘরে এসে শুলাম। যা হচ্ছে ঠিক হচ্ছে না। একদমই ঠিক হচ্ছে না।

* * * *

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙতে দেরি হল বেশ। গত কয়েকদিনের মানসিক উদ্বেগ আমাকে পেড়ে ফেলেছিল একেবারে। সেই ক্লান্তি কাটতে কাটতেই সকাল দশটা! ইশ, এত বেলা হয়ে গেল?

বিছানা থেকে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে রুমে আসতেই দেখি দরজার সামনে শ্রীমান মংকুকুমার বত্রিশ পাটি বিকশিত করে দাঁড়িয়ে। একটু ধমকে জিজ্ঞাসা করলাম, ''কাল ছিলি কোথায় সারাদিন? পাত্তা নেই যে?''

তিনি কোলগেটের জ্বলন্ত বিজ্ঞাপন হয়ে উত্তর দিলেন, ''পরাগদা একটা কাজ দিয়েছিল। তাই আসতে পারিনি।''

রেগে গিয়ে দুটো কড়া কথা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলাম। হাজার হোক, মংকু আমার মাইনে করা কর্মচারী নয়। কাকুর আদেশে আমাকে একটু সাহায্য করছে এইমাত্র, তাও বিনা পয়সায়। রোজ রোজ অফিসের বাবুদের মতো সকাল নটায় আমার দরজায় এসে 'গুড মর্নিং' বলে দাঁড়াবে, এতটা আশা করা অন্যায় নয় কি?

একটু নরম হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ''তাহলে আজ কী মনে করে? পরাগদা আজ কোনো কাজ দেয়নি তোমাকে?''

কথাটার জবাব দিল না মংকু, শুধু চোয়ালটা আরও চওড়া করে বলল, ''একজন বাবু শিলিগুড়ি থেকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। বাইরের ঘরে বসে আছেন। বাবু আপনাকে খবর দিতে বললেন।''

বুকটা ধক করে উঠল। কাকা এসে গেলেন নাকি? কাকু-কাকিমাকে আমার বলাই ছিল ওঁর আসার ব্যাপারে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আসার তো কথা না! শিলিগুড়ি থেকে ট্রেন ডিব্রুগড় অবধি টাইম নেয় প্রায় ষোলো ঘণ্টা। কাকার সঙ্গে কথা হয়েছে কাল সকাল এগারোটা নাগাদ। উনি যদি তখনই রেডি হয়ে বেরোন,

তাতেও ট্রেন ধরতে ধরতে বিকেল। মানে এখানে আসতে আসতে আজ প্রায় সন্ধেবেলা হওয়ার কথা। এত সকালে পৌঁছোনোর তো প্রশ্নই ওঠে না। নাকি কাকার বদলে অন্য কেউ দেখা করতে এসেছেন?

তাড়াহুড়ো করে একটা টিশার্ট গলিয়ে বৈঠকখানায় এসে পৌঁছে দেখি যা ভেবেছি ঠিক তাই। ঘরের মধ্যে সদানন্দকাকু আর কাকিমা হাজির, এক কোণে মাধুরীও বসে আছে জড়োসড়ো হয়ে। আর প্রধান চেয়ারটাই দখল করে আছেন আর কেউ না, স্বয়ং কাকা!

বললে বিশ্বাস হবে না, লোকটাকে দেখামাত্র কোথা থেকে যেন বুকের ভেতর থেকে একটা পাথর নেমে গিয়ে সেই জায়গায় বেশ খানিকটা জোর, বেশ খানিকটা সাহস চলে এল। মনে হল এই লোকটা একবার যখন এসে গেছে তখন আর ভয় নেই।

এখানে বলে রাখা ভালো, কাকার পুরো অ্যাপিয়ারেন্সের মধ্যেই একটা ভরসা দেওয়ার মতো ব্যাপার ছিল। ঠান্ডা মাথার লোক, কোনো কিছু আগ বাড়িয়ে বলেন না বা বোঝেন না। কোনো মতামত শোনা মাত্রই নস্যাৎ করেন না বা অন্ধের মতো বিশ্বাসও করেন না। কাউকে ছোট করেন না, কাউকে অযথা পাত্তা দেন না। শুধু ঠোঁটের ডগায় একটা স্মিত ঝুলিয়ে রেখে সমস্যাগুলো শোনেন আর আশ্চর্য বুদ্ধিমত্তায় সেগুলোর সমাধান করেন।

''কাকা, কখন এলেন?'' হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করলাম।

''এই তো ভোরের ফ্লাইটে।'' উজ্জ্বল চোখদুটো আমার দিকে মেলে হাসিমুখে জবাব দিলেন কাকা। একটু লজ্জিত হলাম, এই অপশনটার কথা মাথাতেই আসেনি! আবার একটু অবাকও লাগল, ফ্লাইটে এসেছেন মানে সে তো কম খরচার ব্যাপার না। আমার কথা ভেবে এতটা খরচ করলেন উনি? মনে মনে ভাবলাম, এই সমস্যার সমাধান করে যেদিন শিলিগুড়িতে পা দেব সেইদিনই এই টাকাটা মিটিয়ে দেব ওঁকে।

হায়, যদি জানতাম, সে সুযোগ আর কখনই পাব না!

কাকিমাকে দেখলাম প্রায় গলবস্ত্র হয়ে বসে আছেন, যেন কোনো গুরুঠাকুর এসেছেন। অথচ আমি কিন্তু এখনও এঁদের কাকার ব্যাপারে বিশদে কিছু বলিইনি। তবে কাকার শান্ত সমাহিত ভাব দেখে অনেকেই ওঁকে সাধু-সন্ন্যাসী গোছের ভাবেন। লোকেরও অবশ্য দোষ নেই। মাঝে মাঝেই আশেপাশের লোকজনকে এমন এমন কথা বলে চমকে দেন, লোকে তার থই পায় না। অথচ কাকাকে গেরুয়া দূরে থাক, হাফহাতা শার্ট আর ঢোলা ট্রাউজার ছাড়া অন্য কিছু পরতে দেখিনি। তবুও লোকটার মধ্যে একটা ভূয়োদর্শী সাধক সন্ন্যাসী গোছের ভাব বড়ই প্রবল ছিল।

গিয়ে বুঝলাম যে একটা অনুরোধ-উপরোধের মধ্যে এসে পড়েছি। কাকিমা অনুরোধ করছেন এ বাড়িতেই থেকে যেতে। অনুরোধটা অসংগত নয়, এ বাড়িতে আরও একটা গেস্ট রুম আছে। কিন্তু কাকা দেখলাম স্মিতহাস্যে ক্রমাগত ঘাড় নেড়ে সে অনুরোধ উপেক্ষা করে চলেছেন। শেষমেশ কাকিমা হতাশ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ''বাবা, তুমিই ওনাকে বলো না এখানে থেকে যেতে?''

আমি কিছু বলার আগেই কাকা আমার দিকে তাকিয়ে শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন, ''না ভবতারণ, আমার পক্ষে এখানে থাকায় কিছু অসুবিধা আছে। এখানে থাকব না বটে, তবে আমি যখন তোমার কথা শুনে এসেছি, এঁদের সব সমস্যার সমাধান করে দিয়ে যাব। কিন্তু তোমারও এখানে আর এক মুহূর্ত থাকা উচিত নয়। আমি বলছি, আধঘণ্টার মধ্যে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। আমরা সার্কিট হাউসে গিয়ে থাকব।''

একটু আশ্চর্য হলাম। কাকা এমনিতে খুবই মৃদুভাষী লোক। এমন আদেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে আজ অবধি আমার সঙ্গে কোনোদিন কথা বলেননি। কেন জানি আমার ভেতরে কে যেন বলল এই আদেশ আমার মান্য করা উচিত, তাতে আমার ভালোই হবে।

পরক্ষণেই চোখ পড়ল মাধুরীর দিকে। জানি না সেই দৃষ্টিতে কী ছিল, আকুতি নাকি অনুরোধ, আমার বুকের ভেতর যেন কী একটা সজোরে বিঁধে গেল। আমি শান্ত স্বরে কাকাকে বললাম, ''না কাকা, এই মুহূর্তে এই বাড়ি ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এঁরা আমার ওপর অনেক ভরসা করে আছেন।''

কাকা একবার আমার দিকে, একবার মাধুরীর দিকে তাকালেন। চোয়াল দুটো সামান্য শক্ত হয়ে এল ওঁর। চোখ বুজলেন একবার, বিড়বিড় করে কী যেন উচ্চারণ করলেন। তারপর চোখ খুলে বললেন, ''ঠিক আছে, তাহলে তাই হোক। কিন্তু তোমাকে এই বাড়িতে রেখে যাওয়ার আগে তোমার জন্য একটি ক্রিয়া করতে হবে যে আমাকে।''

''ক্রিয়া? কীসের ক্রিয়া?''

কাকা কিছু বললেন না। একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ উঠে আমার হাত ধরে টেনে বললেন, ''চলো, একটা জিনিস দেখাই তোমাকে।''

বলে আমাকে টেনে এনে বাইরে রোদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ''দেখলে?''

চারিদিকে তাকালাম। কই, বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো তো কিছু নজরে পড়ল না!

''ওখানে নয়, নীচে। নিজের ছায়ার দিকে তাকাও।''

তাকালাম। আমার মাথার পেছনে সকাল এগারোটার সূর্য। পায়ের কাছে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে আমার ছায়া। তার সব কিছুই ঠিকঠাক, শুধু মাথাটা নেই।

সেই কবন্ধ ছায়ার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর আমার ভীষণ শীত করতে লাগল। কাকার দিকে তাকিয়ে কাতর সুরে জিজ্ঞাসা করলাম, ''এর মানে কী কাকা?''

কাকা ফিসফিস করে বললেন, ''কাউরীবুড়ির ছায়া পড়েছে তোমার ওপর ভাইপো। এ বড় ভয়ংকর ছায়া। এ বাড়িতে কাউরীবুড়ির ছায়া ঢুকেছে। থেকে থেকে কোনো বিধবা মহিলাকে দেখতে পাও না?''

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম। অন্তত দু-দুবার কাকে যেন দেখেছি ওই কুয়োতলার পাশে।

''কাউরীবুড়ির ডাক তোমার পিছনে ফিরছে ভবতারণ। যেদিন তুমি ওই মন্দিরে গেছিলে, সেদিন থেকেই এ ছায়া তোমার পিছু নিয়েছে। তোমার নিস্তার নেই তার হাত থেকে। সেই রোষে তুমিও মরবে, এদেরও মারবে।''

''আর মাধুরী? তার কী হবে কাকা?'' ঠকঠকানিটা আটকাতে দাঁতে দাঁত চেপে বললাম কথাটা।

''ও আর বেঁচে নেই ভবতারণ'', ধীর অথচ শান্ত সুরে বলা কথাটা আমার মগজে সেঁধোতে একটু সময় নিল, ''ওর ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে গেছে। ওর আয়ু আর মাত্র দু'দিন।''

* * * *

গতকাল ওই সকালেই আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন কাকা। প্রথম গন্তব্য ছিল পরাগ বসুমাতারির বাড়ি। প্রথম দিনই পরাগের অফিসের ফোন নাম্বার চেয়ে নিয়েছিলাম আমি, তাই তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বেশি কষ্ট করতে হয়নি।

''কিন্তু কাকা'', রিকশা করে যেতে যেতে একটা বাম্পারে ঝাঁকুনি খাওয়ার মুখেই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করে ফেললাম, ''আবার ওর বাড়ি গিয়ে কী হবে? যা জানবার সেসব তো আমি জেনেই এসেছি।''

কাকা কোনো জবাব দিলেন না। মুখটা অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে আছে। আমি আবার খোঁচালাম, ''আপনার কী মনে হয়, আরও কিছু জানার আছে ওদের থেকে?''

রিকশা থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিতে দিতে গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন কাকা, ''অনেক কিছু জানার আছে ভাইপো, অনেক কিছু। তুমি কিছুই জানোনি।''

''কেন?'' একটু প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলাম আমি, ''যা যা জেনেছি তা সবই তো বলেছি আপনাকে, বলিনি?'' পরাগের বাড়ি যাওয়ার পথে হাঁটতে হাঁটতে বললাম আমি।

''তাই?'' হাঁটা থামিয়ে আমার দিকে তাকালেন ভদ্রলোক, ''সব জানিয়েছ?''

''হ্যাঁ।''

‘‘সব জেনেছ?’’

‘‘হ্যাঁ।’’

আমার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নাড়া শুরু করলেন ভদ্রলোক। ‘‘ভুল ভাইপো, ভুল। তুমি যা যা জেনেছ তার সবই আমাকে বলেছ বটে, কিন্তু যেগুলো জানা উচিত ছিল সেগুলোই জানোনি। অথবা জানার চেষ্টা করোনি। অথচ এই রহস্য ভেদ করতে গেলে...’’

বেশ দৃঢ় আপত্তি জানালাম এই কথায়, ‘‘আপনি ঠিক বলছেন না কাকা। যে যে তথ্য দরকার তার সবই তো বলেছি আপনাকে।’’

‘‘বটে?’’ মৃদু হাসলেন কাকা, ‘‘তাহলে বলো তো ভায়া, অনির্বাণের সঙ্গে কথা বলেছিলে?’’

‘‘সে কী করে বলব?’’ আমি আপত্তির সুরে বললাম, ‘‘তাকে তো কাকু-কাকিমা খুঁজেই পাচ্ছেন না।’’

‘‘খুঁজেই পাচ্ছেন না মানে? অত বড় একটা চা-বাগানের একজন দায়িত্বশীল কর্মীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না? যেখানে সদানন্দবাবু নিজে একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী? কথাটা বিশ্বাস হল তোমার?’’

মাথা চুলকোতে লাগলাম। সত্যিই তো, এভাবে তো ভেবে দেখিনি।

‘‘তুমি নিজে খোঁজ করার চেষ্টা করেছিলে?’’

মাথা নাড়লাম, ‘‘না...মানে সময় পেলাম কই?’’

‘‘ছেলেটাকে না পেলে যে এই রহস্যের একটা বড় দিক অন্ধকারে থেকে যাচ্ছে সেটা বুঝছ?’’

বুঝলাম। এরপর মাথা নীচু করে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। তবে কাকা ছাড়বার লোক নন। তাঁর পরের প্রশ্নবাণ ধেয়ে এল, ‘‘কাউরীবুড়ির মন্দিরে যে মহিলার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল তাঁর নাম কী?’’

‘‘ইয়ে, মানে নামটা তো জিজ্ঞেস করা...’’

‘‘কে তিনি? নিশ্চয়ই লোকাল লোক, নইলে অনেক দূর থেকে উজিয়ে কেউ পুজো করতে আসে না।’’

‘‘সে আমি কী করে জানব?’’

‘‘জানার চেষ্টা করেছিলে?’’

এবার ঘোরতর প্রতিবাদ করে উঠলাম, ‘‘এ তো বড় অসম্ভব কথা বললেন কাকা। এত বড় শহরে কোথায় খুঁজব ওই মহিলাকে?’’

‘‘এত বড় শহর?’’ কাকার গলায় বিদ্রুপের ছাপ স্পষ্ট, ‘‘কত বড় টাউন তিনসুকিয়া? কলকাতার থেকেও বড়? শিলিগুড়ির থেকেও বড়?’’

চুপ করে রইলাম।

‘‘মাধুরীকে কোন মূর্তি দিয়েছিলেন ওর দিভাই? তার বর্ণনা জানার চেষ্টা করেছ?’’

মাথা নাড়লাম। না।

‘‘সিঁদুর পরার সময় কার সতর্কবাণী শুনত মাধুরী? সে স্বর কি ওর চেনা কারও?’’

এর উত্তরও জানি না। তবে চেনা কারও হলে কি মাধুরী আমাকে সেটা জানাত না?

‘‘পরাগ কেন রাজি হয়ে গেল ওই লতা তুলে আনতে? শুধুই টাকার লোভ?’’

‘‘সে তো বটেই। এ ছাড়া আর কী কারণ থাকতে পারে বলুন?’’

‘‘একজন দেওরি আদিবাসী, খুব সম্ভবত প্রথম প্রজন্মের শিক্ষিত, সে নাকি শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে এতটাই সংস্কারবিহীন হয়ে উঠেছে যে অমন ভয়ংকর মন্দিরে তোমার সঙ্গে এক্সপিডিশনে যেতে রাজি হয়ে গেল? ওর বড় ঠাকুর্দা কিছু বললেন না বা বারণ করলেন না? তিনিও হঠাৎ প্রচণ্ড সংস্কারমুক্ত নাস্তিক হয়ে পড়লেন নাকি?’’

চুপ করে রইলাম।

''আমি বাজি ধরতে পারি ভাইপো, ওই দাদু-নাতি মিলে একটা মস্ত কিছু চেপে যাচ্ছে তোমার কাছে। আমি জানি না সেটা কী, তবে আন্দাজ করতে পারি।''

''সেটা কী কাকা?'' গলাটা শুকনো শুকনো লাগছিল আমার।

''ওই বুড়ো জানে পাতরগোঁয়্যাদের গ্রামে কী হয়েছিল। ও জানে যে কাউরীবুড়ি কী অভিশাপ দিয়েছিলেন। ও জানে কীসের অভিশাপে ছারখার হয়ে গেছিল সেই জনজাতি। সেটা ও চেপে যাচ্ছে ভবতারণ। আমি এ বিষয়ে একদম নিঃসন্দেহ।''

''কিন্তু আমাকে এসব লুকিয়ে ওদের লাভ?'' কাতর কণ্ঠে বললাম।

''সে লাভ-লোকসানের গল্প তো ওই বুড়ো বলবে ভাইপো। আর বলবে ওর নাতি, শ্রীমান পরাগ বসুমাতারি।''

''কিন্তু সেসব জেনে আমাদের বিশাল কিছু লাভ হবে কি কাকা?''

কাকা ঘুরে দাঁড়িয়ে দু'হাতে আমার কাঁধদুটো খামচে ধরলেন, ''লাভ মানে? এই পুরো রহস্যে এই দুটো মাত্র সূত্রই তো আমার কাছে অধরা আছে ভাইপো। বাকি তো সব দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার।''

ভদ্রলোক যে কী বলছেন সেসব আমার মাথায় ঢুকছিল না। বাকি সবই দিনের আলোর মতো পরিষ্কার মানে? গত তিনদিন ধরে যে রহস্য নিয়ে আমি থই খুঁজে পাচ্ছি না, উনি স্রেফ একদিনের মধ্যেই প্রায় তার সমাধান করে ফেললেন? তাও দুটো মাত্র সূত্র বাদ দিয়ে?

''কোন দুটো সূত্র কাকা? জানতে পারি?''

''প্রথম হচ্ছে ওই পাতরগোঁয়্যাদের শেষ গল্পটা। কী হয়েছিল ওদের? কী এমন ভয়ানক অপরাধ করেছিলেন ওদের সেই বড়দেওরি, যে, তার জন্য ওদের পুরো জাতটাই ধ্বংস হয়ে গেল?''

''আর দ্বিতীয়টা?''

''সেদিন মাধুরীকে রেপড হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে কে এসেছিলেন? কে সেই বৃদ্ধা?''

''সে তো মাধুরী বললই যে ও চিনতে পারেনি...''

আমার দিকে গভীরভাবে তাকালেন কাকা। তারপর বললেন, ''ব্যাপারটা যত সহজ ভাবছ তত সহজ নয় ভাইপো। এর মধ্যে অনেক জটিলতা আছে। ওটা না জানলে এই রহস্যের জট ছাড়াতে পারব না হে। বাকি সবই আমার মোটামুটি জানা।''

কথাটা আমার বিশ্বাস হতে চায় না। ''কী বলছেন কী কাকা? বাকি সবই জেনে গেছেন আপনি?''

গম্ভীর মুখে মাথাটা দুবার ওপর-নীচে করলেন কাকা। ''জেনে গেছি বই কি ভাইপো। আর যদি মাথা ঠান্ডা করে নিজেই নিজেকে কতগুলো প্রশ্ন করতে, তাহলে বুঝতে পারতে কথাটা কেন বলছি আমি।''

''যেমন?'' চ্যালেঞ্জের সুরে বললাম আমি।

''এত ভিজে পোড়া কাঠের গন্ধ পাও কেন ভবতারণ, ভেবেছ কখনও? কাউরীবুড়ির মন্দিরে এত কাক কেন? পাতরগোঁয়্যাদের বড়দেওরির প্রথম সন্তান জন্মাবার পর বিধবা হতে হতই কেন? সত্যি বলো তো ভাইপো, তুমি কি কিছুই আন্দাজ করতে পারোনি?''

বেকুবের মতো মাথা নাড়লাম।

কাকা ফের চলতে শুরু করলেন।

যেখানে রিকশা থেকে নেমেছিলাম, সেখান থেকে পরাগের বাড়ি যেতে সময় লাগল ঠিক দশ মিনিট। সহজ রাস্তা, গুলোবার চান্সই নেই।

পরাগ বাড়িতেই ছিল। আমাদের বসতে বলল দাওয়াতে। লক্ষ করলাম কালকের তুলনায় একটু গম্ভীর হয়ে আছে ছেলেটা। আমাদের দেখে একটি ছোট মেয়েকে বড় ঠাকুর্দাকে নিয়ে আসার জন্য আদেশ দিল পরাগ। মেয়েটি উঠোনে এক্কাদোক্কা খেলছিল। বেজার মুখে ভেতরে গেল বুড়োকে ডেকে আনতে।

এই অবসরে কাকার সঙ্গে পরাগের আলাপ করিয়ে দিলাম। পরাগ স্মার্টলি হ্যান্ডশেক করে ‘‘হ্যালো’’ বলতেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। কাকা ওর হাত কিছুক্ষণ ধরে থেকে দুম করে বলে বসলেন, ‘‘মেয়েটার উদ্দেশ্য ভালো না ভাই, দয়া করে ওর জালে ফাঁসবেন না। আপনাকে খেলাচ্ছে ও। সোনার হার, দামি রিস্টওয়াচ এসব দিয়েছেন ঠিক আছে। তবে আর কোনো আর্থিক চাহিদা মেটাতে যাবেন না কিন্তু, আখেরে পস্তাবেন। এ মেয়ে ভালো নয়, আপনাকে ফতুর করে উড়ে গিয়ে অন্য ডালে বসবে। আর হ্যাঁ, অফিসের ক্যাশ ভাঙার কথা ভুলেও ভাববেন না। যে সাবানে অফিসের ক্যাশবাক্সের চাবির ছাপ তুলে নিয়ে এসেছেন, ওটা ফেলে দিন। আপনার বড় সাহেব কিন্তু এসবের আঁচ পেয়েছেন, আপনার ওপর নজর রেখে চলেছেন উনি। বিন্দুমাত্র বেচাল দেখলেই আপনি জেলে যাবেন, লিখে রাখুন।’’

আমি তো স্তব্ধ! তবে দেখার মতো অবস্থা হল পরাগের। দশ সেকেন্ড মতো হাঁ করে কাকার দিকে চেয়ে রইল সে। তারপর কাটা কলাগাছের মতো কাকার পায়ে পড়ে গেল, ‘‘স্যার...স্যার...আপনি ভগবান স্যার। জালে আটকে গেছি স্যার। বেরোতে পারছি না। দয়া করে বাঁচান আমাকে।’’

কাকা ঝট করে নীচু হয়ে পরাগের কাঁধে হাত দিয়ে তুলে ধরলেন ওকে। তারপর বললেন, ‘‘টাকা ব্যাপারটা ভালো, তবে যদি সৎপথে আসে, তবেই। আর মেয়েটা সত্যিই ভালো না। কী করে সে?’’

‘‘শিলিগুড়ির ডান্সবারে কাজ করে। ডান্সগার্ল।’’

‘‘আমার গণনা বলছে মেয়েটি কোনো আত্মঘাতী, স্বজাতিদ্রোহী কাজের সঙ্গে যুক্ত। এর সঙ্গে থাকলে আপনার অপঘাত মৃত্যু অনিবার্য।’’

‘‘আমি পারছি না স্যার, মাইরি বলছি। আজকাল সত্যিই ওর রকমসকম আমার অদ্ভুত ঠেকছে। আমি চাইলেও এই জাল কেটে বেরিয়ে আসতে পারছি না স্যার। ও শুধু আমাকে থ্রেট দিচ্ছে, বলছে যে আমার সবকিছু ও এখানে এসে ফাঁস করে দেবে।’’

কাকা বরাভয় দেওয়ার ভঙ্গিতে হাত তুললেন, ‘‘সেসব আমি দেখে নেব ভাই। আপনি শুধু কথা দিন, দরকারের সময় আপনি আমাদের সাহায্য করবেন?’’

পরাগ খুব সম্ভবত কাকার পায়ে আবার ডাইভ দিতে যাচ্ছিল। আমি আটকালাম, কারণ ততক্ষণে পরাগের বুড়ো ঠাকুর্দা দরজা খুলে বারান্দায় এসে উপস্থিত।

আমাকে দেখে স্মিত হাসল বুড়ো, তারপর কাকার দিকে দু’হাত তুলে নমস্কার করে বলল, ‘‘এনাকে তো চিনলাম না বাবু।’’

কাকাও প্রতি-নমস্কার করে হাসিমুখে বললেন, ‘‘পৃথিবীতে কে-ই বা আর অন্য কাউকে ভালো করে চেনে বলুন। আমি কে. এন. ভট্টাচার্য, শিলিগুড়িতে থাকি। ভবতারণ আমার নিজের ভাইপো বললেই চলে। ও বলল কীসব নাকি দামি লতার খোঁজ পেয়েছে, তাই আমার সাহায্য দরকার। সুযোগ বুঝে আমিও চলে এলাম এখানে। আসামের এই দিকটা আমার দেখা ছিল না কিনা।’’

বুড়োর মুখে স্মিত হাসি, যেন কেমন একটা ‘‘মিথ্যে কথার দরকার ছিল না বাবু, আমি জানি আপনি কেন এসেছেন’’ মার্কা হাবভাব। তারপর সরাসরি বলল, ‘‘বলুন বাবু, কী জানতে চান।’’

‘‘আজ থেকে আড়াইশো বছর আগে পাতরগোঁয়্যাদের গ্রামে কী হয়েছিল দাদামশাই? কীসের অভিশাপ দিয়েছিলেন কাউরীবুড়ি?’’

বুড়ো আর পরাগ তো বটেই, আমিও হকচকিয়ে গেছিলাম এমন আক্রমণের সামনে পড়ে। কাকাকে চিরকালই দেখে এসেছি ধীরস্থির একজন মানুষ হিসেবে। কোনো তাড়াহুড়ো করার লোক তিনি নন। সেই তিনিই যে আলাপ-পরিচিতির বালাই না রেখে এমন একটা কামান দেগে বসবেন সে আমরা জানব কী করে?

বুড়ো স্পষ্টতই এই আক্রমণের সামনে হতচকিত। আমার আর পরাগের দিকে ইতিউতি তাকাচ্ছে। আমার দিকে তাকিয়ে অবশ্য লাভ ছিল না, আমিও একই রকম বিস্ময়বিমূঢ়। পরাগ দেখলাম মাথাটা একেবারে

বুকের কাছে সেঁটে পায়ের ডান আঙুল দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটছে।

''কীসের কথা বলছেন বাবু, কিছুই তো বুঝছি না।''

সামান্য হাসলেন কাকা, তারপর বললেন, ''ভবতারণের কাছ থেকে সবই শুনেছি দাদামশাই। কাল যে পরাগ আর ভবতারণ কাউরীবুড়ির মন্দির থেকে গোলকপুষ্পের লতা তুলে আনতে যাওয়ার প্ল্যান করেছে সেও জানি।''

বুড়ো কিছু বলল না, সরু চোখে কাকার দিকে চেয়ে রইল।

''এতে আপনার সায় আছে দাদামশাই?''

''আমার সায় থাকা না থাকায় আর কী এসে যায় বলুন। আজকালকার বাচ্চা, ওরা কি আর আমার কথা শুনে চলে বাবু?''

''সে কী! অমন বিপজ্জনক জায়গা, যেখানে গেলে নাকি কেউ বেঁচে ফেরে না, সেখানে আপনার নাতি যাচ্ছে প্রাণ হাতে করে, তাতে আপনার আপত্তি নেই?''

বুড়ো একটু নড়েচড়ে বসল, শরীরী ভাষায় স্পষ্টতই একটা অস্বস্তির ভাব। ''দেখুন বাবু, আপনাকে বরং খুলেই বলি। পরাগের একটু টাকার দরকার হয়ে পড়েছে হঠাৎ করে। তাই ও ভাবছিল যদি এই মওকায়...''

''কথাটা কি খুব বিশ্বাসযোগ্য হল দাদামশাই? আপনাদের দেওরিদের তিন-তিনটে জনজাতির এতদিনের বিশ্বাস ভেঙে শুধুমাত্র টাকার জন্য আপনার নাতিকে আপনি সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে চাইছেন?''

সবাই চুপ। বুড়ো মাথা নীচু করে বসে আছে। কাকা সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। বুঝতে পারছি যে একটা মানসিক লড়াই চলছে দুজনের মধ্যে।

''আমি যদি বলি যে আপনি জানেন আজ থেকে আড়াইশো বছর আগে পাতরগোঁয়্যাদের গ্রামে কী হয়েছিল, সেটা খুব ভুল বলা হবে কি?''

ঘন ঘন মাথা নাড়ছে বুড়ো, ''না বাবু, আমি কিছু জানি না, কিচ্ছু জানি না।''

''আপনি জানেন যে কাউরীবুড়ি কী অভিশাপ দিয়েছিলেন ওদের।''

''না বাবু। আমি সত্যিই জানি না।''

''আপনি এও জানেন যে ওদের সেই অভিশপ্ত বড়দেওরি ঠিক কী পাপ করেছিলেন।''

''না বাবু, আমি...''

''এবং আমি এও অনুমান করতে পারছি আপনি কেন পরাগকে ওখানে পাঠাতে চাইছেন। টাকার জন্য নয়, ও গোলকপুষ্পের লতা তুলে আনতে চাইছে সম্পূর্ণ অন্য একটা কারণে।''

''না বাবু, আপনি ঠিক...''

''যে কাজ আপনারা অনেকদিন ধরে করতে চাইছেন, কিন্তু পারছেন না। পারছেন না, কারণ আপনারা এমন একজনকে খুঁজছিলেন যে জানবে ওখানে যাওয়ার আর ফিরে আসার রাস্তাটা কী...''

''বাবু...বাবু...''

''আজ ভবতারণ আপনাদের সামনে সেই সুযোগ এনে দিয়েছে। তাই মংকুর মুখে খবর পেয়েই দৌড়ে এসেছিল পরাগ। তাই...''

কাকার কথাটা শেষ হল না, বুড়ো দেখি ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করেছে। পরাগ দৌড়ে এসে না ধরলে হয়তো দাওয়াতে পড়েই যেত লোকটা। আমিও ব্যস্তসমস্ত হয়ে এগিয়ে গেলাম ওদিকে। একমাত্র কাকাই কিছু করলেন না, শান্ত চোখে দেখতে লাগলেন ব্যাপারটা।

অবশ্য বেশি কিছু করতে হল না। মুখেচোখে একটু জলের ছিটে দিতেই উঠে বসল বুড়ো। এখন তার চোখমুখের ভাব পুরো পালটে গেছে। চালাকচতুর হাবভাবের বদলে সেখানে এখন একটা হতভম্ব ভাব।

বুড়ো একটু থিতু হতেই এগিয়ে গিয়ে তার পাশে বসলেন কাকা। তারপর শান্ত স্বরে বললেন, ''আমাকে যদি সবকিছু খুলে বলেন দাদামশাই, আমি কথা দিচ্ছি যে কাজ শেষ করার জন্য আপনি পরাগকে ওখানে

পাঠাচ্ছেন, আমি সর্বতোভাবে তাতে সাহায্য করব।''

বুড়ো খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর মুখ তুলে চাইল আকাশের দিকে। মেঘলা আকাশ, একটা ভ্যাপসা গুমোট আবহাওয়া চারিপাশে। একফোঁটা হাওয়া নেই। গাছের একটা পাতা নড়ছে না।

''সে অনেক পুরোনো গল্প বাবু। আজ থেকে অনেক দিন আগেকার... ওই যে বললেন আড়াইশো বছর, ওই আড়াইশো বছর আগেকার কথা।

পাতরগোঁয়্যাদের বড়দেওরি ছিলেন রাজকুমারী চাংদেওমাই। হ্যাঁ, বড়দেওরিকে ওরা রাজকুমারীই বলত। ওরা মনে করত বড়দেওরি স্বয়ং কাউরীবুড়ির বংশধর।

দেওরিদের উপকথা অনুযায়ী ওরা হল জিমো ছাঁয়া, মানে সূর্যদেব আর চন্দ্রদেবীর সন্তান। পাতরগোঁয়্যারা বলত কাউরীবুড়ি হচ্ছেন সেই চন্দ্রদেবীর প্রথম কন্যাসন্তান। কাউরী মানে কাক। লোকে বলত চন্দ্রদেবী অস্তাচলে গেলে প্রথম যে পাখি ডেকে ওঠে সে হচ্ছে কাক। কাকেরা চন্দ্রদেবীর প্রতিভূ হয়ে পৃথিবীর দেখাশোনা, রক্ষণাবেক্ষণ করে। আর সেই কাকেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্ছেন কাউরীবুড়ি। আর এই কাউরীবুড়ির থেকেই পাতরগোঁয়্যাদের উৎপত্তি। কাউরীবুড়ির যে প্রথম সন্তান, সেও ছিল একটি মেয়ে। সেই মেয়েই পাতরগোঁয়্যাদের প্রথম বড়দেওরি।

বড়দেওরিকে ওরা ঈশ্বরের সমান শ্রদ্ধা করত। তিনি ছিলেন পাতরগোঁয়্যাদের সব কিছু, তাঁর আদেশই ছিল শেষ কথা।''

''প্রথম সন্তান মানে? বড়দেওরিদের আরও সন্তান হত নাকি?''

''আগে হত। তখন বড়দেওরিরা অনেক সন্তানের জন্ম দিতে পারতেন। যদিও প্রথম সন্তান সবসময় মেয়েই হত। তিনিই হতেন পরের বড়দেওরি।''

''সেটা উঠে গেল কবে?'' প্রশ্ন করলেন কাকা।

জানা গেল, যবে থেকে ওরা মনে করা শুরু করল বৈধব্য ব্যাপারটা খুব পবিত্র, তবে থেকেই। ওরা বিশ্বাস করত যে কাউরীবুড়ি ছিলেন বিধবা, এবং বৈধব্য একটা পবিত্র ব্যাপার। এমনকি পাতরগোঁয়্যাদের মেয়েদের মধ্যেও বিধবা হওয়া ব্যাপারটা জাঁকিয়ে বসে। তার ওপর ওদের তুকতাকের ব্যাপারটা জুড়ে দিয়ে লোকে বলা শুরু করল যে পাতরগোঁয়্যাদের মেয়েরা বিয়ের পর মন্তর পড়ে তাদের স্বামীদের মেরে ফেলে, জোর করে বিধবা হয়। যাতে করে তারা কাউরীবুড়ির আরও প্রিয়পাত্রী হয়ে ওঠে।

''পাতরগোঁয়্যাদের প্রতিটি বড়দেওরিকে তার প্রথম সন্তানের জন্মের পর বিধবা হতেই হত, এমনকি সেই সন্তানের প্রথম জন্মদিনে তার হতভাগ্য বাবাকে বলিও দেওয়া হত। এতদিন অবধি সেই নিয়মের কোনো ব্যত্যয় হয়নি। হল এই চাংদেওমাইয়ের সময়ে।

চাংদেওমাই তাঁর বিবাহিত স্বামীকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি ঠিক করলেন তাঁর স্বামীকে যে করে হোক বলির হাত থেকে বাঁচাবেন।

যেদিন বলি হবে, তার আগের রাত থেকেই ওদের গ্রামে উৎসব শুরু হত। মদ আর মাংসের এলাহি বন্দোবস্ত থাকত। চাংদেওমাই করলেন কী, ওই গোলকপুষ্প লতার একটা তখনও না-ফোটা কুঁড়ি বেটে মদের গামলায় মিশিয়ে দিলেন।''

''কেন? গোলকপুষ্পের কুঁড়ি কেন?''

''আপনার ভাইপোকে কালই বলেছি বাবু, এ দুনিয়ার ফুলই নয়, পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর পাতাল থেকে তুলে আনা অভিশাপ।'' শুকনো গলায় বলল বুড়ো, ''ও ফুল বছরে একবারই ফোটে, কামাখ্যা মায়ের অম্বুবাচী পুজোর দিন। তখন সেই ফুল থেকে আশ্চর্য সব ওষুধ তৈরি করা যায়। কিন্তু তার আগে যদি ওই ফুল তোলা হয় বাবু, তবে তা সাক্ষাৎ কালসাপের গরল। ওই একটিমাত্র ফুলের এত তীব্র বিষ, যা একটা গোটা গ্রামের লোককে চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে।

চাংদেওমাই অবশ্য অতটা চাননি। বড়দেওরিরা বংশানুক্রমে এই ফুলের ব্যবহার জানতেন। তিনি ততটাই প্রয়োগ করেছিলেন, যতটা করলে এক রাতের জন্য গোটা গ্রাম ঘুমিয়ে থাকে। তাঁর মতলব ছিল যে সেই সুযোগে তিনি তাঁর স্বামী আর কন্যাকে নিয়ে পাতরগোঁয়্যাদের গ্রাম ছেড়ে, সমাজ ছেড়ে অনেক দূরে অন্য কোথাও চলে যাবেন।

কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা ফলল না। বড়দেওরির কাজে যারা সাহায্য করে, তাদের বলে সারুদেওরি। বড়দেওরির মতো এরাও ছিল মেয়ে। দুই সারুদেওরির কোনো কারণে চাংদেওমাই-এর ওপর সন্দেহ হয়। সেই রাতে পুরো গ্রাম হুল্লোড় করে মদ-মাংস খেলেও তারা ওসব না ছুঁয়ে আড়াল থেকে নজর রাখছিল চাংদেওমাই-এর ওপর।

মাঝরাতে যখন চাংদেওমাই চুপিচুপি গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন, তখন সেই দুই সারুদেওরি তাঁদের পথ আটকে দাঁড়ায়। পাতরগোঁয়্যাদের কাছে সমাজ ছেড়ে চলে যাওয়া ছিল মস্ত বড় অপরাধ, নিজেদের গোষ্ঠীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। সেখানে স্বয়ং বড়দেওরি নিজে ওদের প্রথা অমান্য করে স্বামীকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন, সে কত বড় অনর্থ!

সেই রাতে বড়দেওরি আর তাঁর স্বামীর সঙ্গে দুই সারুদেওরির প্রবল কথা কাটাকাটি হয়। উত্তেজনার মাথায় বড়দেওরি তাঁর দুই বিশ্বস্ত সহচরীকে কোনো ধারালো অস্ত্রের আঘাতে খুন করে বসেন।''

এতটা বলে আমাদের দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকাল বুড়ো। কাকা বললেন, ''কী হল দাদামশাই, থামলেন কেন?''

''আর তারপরেই নেমে এল কাউরীবুড়ির কোপ।''

এবার আর আমরা কেউ কোনো প্রশ্ন করলাম না বুড়োকে।

''সেই রাতেই আকাশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে এল কাউরীবুড়ির অনুচরেরা। তারা এই দুনিয়ার কাক নয় বাবু, সাক্ষাৎ নরক থেকে উঠে আসা রাক্ষসের দল। তারা প্রথমেই খুবলে নিল অচেতন হয়ে থাকা মানুষগুলোর চোখ। বিষমদের নেশায় ঝাঁঝে বেসামাল হয়ে ছিল ওরা, কিছুতেই কিছু আটকাতে পারল না। সেই কাকেদের দল চাংদেওমাইয়ের চোখের সামনে একটু একটু করে ছিঁড়ে খেল জ্যান্ত মানুষগুলোকে।

চাংদেওমাই বুঝতে পেরেছিলেন কী হতে চলেছে। কিন্তু তাঁর আর কিছু করার ছিল না। নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁকে করতেই হত। নিজের জাদুবিদ্যার জোরে তিনি নিজের স্বামীকে সেই রাক্ষুসে কাকদের হাত থেকে কোনোমতে রক্ষা করে গ্রামের বাইরে বার করে দিলেন। বলে দিলেন তিনি যেন কাল এসে তাঁদের মেয়েকে এখান থেকে নিয়ে যান।

আর চাংদেওমাই তাঁর মেয়েকে নিয়ে রয়ে গেলেন গ্রামের মধ্যে। চারিদিকে এত মৃত্যুর হাহাকার দেখে তীব্র অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলেন পাতরগোঁয়্যাদের বড়দেওরি চাংদেওমাই। তিনি তাঁর জানা সমস্ত জাদুমন্ত্র দিয়ে নিজের সন্তানকে সুরক্ষিত করলেন। তারপর তার মাথায় একটি চুমো খেয়ে দেওথানের উঠোনের অশ্বত্থগাছ থেকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়লেন!''

আমরা সবাই স্তব্ধ।

স্তব্ধতা ভাঙলেন কাকাই। গলাটা একটু খাঁকরে যে প্রশ্নটা করলেন, তাতে বুঝতে পারলাম কেন লোকটাকে আমি এত শ্রদ্ধা করি।

''একটা কথা বলুন তো দাদামশাই। এই কাহিনি আপনি জানলেন কী করে?''

''আমার বাপ-দাদাদের থেকে বাবু। এ ভারী গোপন কাহিনি। তাঁরা আমাদের এও বলে গেছেন যে আমাদের পরিবারের বাইরের যেন কেউ...''

''আপনার বাপ-দাদারাই বা এই গল্প জানলেন কী করে?''

বুড়ো বোধহয় প্রশ্নটা বোঝেনি। হাঁ করে চেয়ে রইল কাকার দিকে। আমিও বুঝতে পারলাম না কাকা হঠাৎ এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করছেন কেন।

সংশয়ের অবসান হল কাকার পরের প্রশ্নেই।

“আপনার কথামতো পাতরগোঁয়্যাদের গ্রামে সেই রাতে যা ঘটেছিল সেটা কারও জানার কথা নয়। সবাই তো মরে গেছে, বলবে কে? আর এদিকে পরাগ যে গল্পটা ভবতারণকে বলেছিল তাতেও তো বাইরের অন্য কারও পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আপনার বাপ-দাদারা জানলেন কী করে?”

এইবার প্রশ্নের কারণটা বুঝলাম। বুড়োর মুখ অন্ধকার হয়ে এল। পরাগের মুখেও একটা ধরা পড়ে যাওয়া অপরাধীর ভাব।

“সেই রাতে পাতরগোঁয়্যাদের গ্রামে যা ঘটেছিল সেটা দেখেছিলেন মাত্র তিনজন। কারণ বাকিরা অচৈতন্য হয়ে ছিল, তারা কিছু দেখার কোনো সুযোগই পায়নি। তিনজনের মধ্যে একজন চাংদেওমাই নিজে। তিনি এ কথা কাউকে বলার সুযোগ পাননি, কারণ সেই রাতেই তিনি আত্মহত্যা করেন। দ্বিতীয়, তাঁর কন্যাসন্তান। কিন্তু তখন তার বয়েস মাত্র এক, তার সেসব মনে থাকার কথা নয়। আর পড়ে থাকেন একজন। যিনি পুরো ঘটনাটা সামনে থেকে দেখেছেন। স্ত্রীর দৌলতে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। পরের দিন সময়-সুযোগ মতো এসে নিজের মেয়েকে নিয়েও গেছেন স্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী।

এবার বলুন তো দাদামশাই, যে ঘটনার এই পৃথিবীতে একজন মাত্র প্রত্যক্ষদর্শী, সেই ঘটনা আপনার বাপ-দাদারা জানলেন কী করে?”

বুলস আই হিট! পলকে বুড়োর সারা মুখ রাঙা। পরাগ একদম শক্ত হয়ে আছে। আমারও মনে হচ্ছে যেন বুকের মধ্যে একটা ইঞ্জিন দৌড়োচ্ছে।

শোনা যায় না এমন একটা দুর্বল স্বর ভেসে এল বুড়োর কাছ থেকে, “চাংদেওমাইয়ের স্বামীর নাম ছিল মগলহানজামা। সেই অভিশপ্ত রাতের পরের দিন সন্ধেবেলায় মগলহানজামা লুকিয়ে লুকিয়ে ফেরত আসেন তাঁর গ্রামে। তারপর মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যান অরুণাচল প্রদেশের দিকে।”

বলে আরেকটু থামে বুড়ো, তারপর ধীর স্বরে বলে, “ওখানে গিয়ে তিনি আরেকটি বিয়ে করেন। অনেকদিন পরে মগলহানজামা তাঁর প্রথম কন্যা, দ্বিতীয় স্ত্রী এবং আরও দুটি পুত্রসন্তান নিয়ে ফিরে আসেন এখানে, আর দিবংগোঁয়্যাদের সমাজে মিশে যান। এখানে এসে একটা নতুন নাম নেন তিনি। আটন। আটন বসুমাতারি।”

* * * *

পরাগের বাড়ি থেকে ফিরতে ফিরতে বেশ বেলা হয়ে গেল। আমরা ফোনে কাকিমাকে বলে দিলাম যে লাঞ্চটা বাইরেই সারব।

পরাগ কেন ওখানে ফিরে যেতে চায় সেটা আমাদের কাছে এখনও খুব একটা স্পষ্ট নয়। পরাগের বক্তব্য, যেহেতু ওরা আসলে পাতরগোঁয়্যাদের উত্তরাধিকারী, তাই সে তার পূর্বপুরুষের বাসভূমিটা একবার দেখে আসতে চায়। বলা বাহুল্য, এ যুক্তিটা আমাদের খুব একটা মনে ধরেনি। তবে কাকা ওর কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছেন যে ও আমাদের সবরকম সাহায্য করবে। ওকে বলেছি গোলকপুষ্পের লতা তুলে দিতে আমাকে সাহায্য করলেই যথেষ্ট। বাকি ওর পিতৃপুরুষের ভিটে নিয়ে ও যা খুশি করুক।

“একটা কথা বলুন কাকা, সেদিন যে ভদ্রমহিলাকে দেখেছিলাম কাউরীবুড়ির মন্দিরে, তিনি যদি চাংদেওমাইয়ের উত্তরসূরি হন, তাহলে তো তিনি লতায় পাতায় এই পরাগেরই আত্মীয় হবেন, তাই নয় কি? তাহলে তো পরাগের জানার কথা তিনি কে, কী বলেন আপনি?” একটা রাস্তার হোটেলে বসে ডাল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে প্রশ্নটা করলাম।

“মনে হয় না। সেক্ষেত্রে পরাগ এতদিন অপেক্ষা করে থাকত না। আর একটা কথা ভেবে দ্যাখো, মগলহানজামা আর পরাগের মধ্যে আড়াইশো বছরের ব্যবধান। তার মধ্যে মন্বন্তর এসেছে, দু-দুখানা

বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, দাঙ্গা, এর মধ্যে ফ্যামিলির কে কোথায় ছিটকে যায় কেউ তার খেয়াল রেখেছে? রাখা সম্ভব?''

''তার মানে আপনার মতে ওদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই, মগলহানজামার দুই স্ত্রীর সন্তানের পরিবার একদম আলাদা হয়ে গেছে, কারেক্ট? তার মধ্যে পরাগের পরিবার জানে যে ওরা পাতরগোঁয়্যাদের একমাত্র উত্তরসূরি। আর চাংদেওমাইয়ের সেই মেয়েটির উত্তরসূরিরা কাউরীবুড়ির মন্দিরে পুজোর ট্র্যাডিশনটাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঠিক বলেছি তো?''

''একদম ঠিক বলেছ। এ ছাড়া অন্য কিছু হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই।''

''আচ্ছা, চাংদেওমাই যখন মারা যান, তখন তাঁর মেয়ের বয়েস এক। তিনি নিশ্চয়ই তাঁর জাদুবিদ্যার কিছুই তাঁর মেয়েকে শিখিয়ে দিয়ে যেতে পারেননি। তাহলে ওই মন্দিরে যে ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার দেখা হল, তাঁর মধ্যেও কি বড়দেওরি হওয়ার জন্য কিছু অলৌকিক শক্তি-টক্তি থাকা সম্ভব?''

খেতে খেতে থেমে গেলেন কাকা, বললেন, ''বলা মুশকিল ভাইপো। ইন ফ্যাক্ট এই প্রশ্নটাই তো আমাকে সবচেয়ে বেশি ভাবাচ্ছে হে। ধরো এমনটাও তো হতে পারে, চাংদেওমাই তাঁর বেশ কিছু গুপ্তবিদ্যা তাঁর ভালোবাসার মানুষ মগলহানজামাকে শিখিয়ে দিয়ে গেছিলেন। মগলহানজামা আবার তাঁর প্রথম সন্তানকে সেই গুপ্তবিদ্যার উত্তরাধিকার দান করে দিয়ে যান। সেই থেকে চাংদেওমাইয়ের মেয়েরা বংশানুক্রমে পাতরগোঁয়্যাদের বড়দেওরির গুপ্তজ্ঞানের অধিকারী। ইনফ্যাক্ট আমার মনে হয় সেটাই ঘটেছিল। নইলে অন্য কারও পক্ষে এতদিন ধরে ওই গোলকপুষ্পের লতা বা ফুলের পরিচর্যা করে যাওয়া সম্ভব নয়।''

''আপনি কী সত্যিই বিশ্বাস করেন যে ওই লতাটার মধ্যে অলৌকিক শক্তি আছে?''

''না।'' কাকার সংক্ষিপ্ত জবাব।

''কিন্তু তাহলে কি ওই পুথিটা ফেক? গোলকপুষ্পের ফুলের গল্পটা ভুল?''

''তা তো বলিনি ভাইপো। গোলকপুষ্পের লতার বা ফুলের একদম অজানা কোনো আয়ুর্বেদিক গুণ থাকতেই পারে। সেটা অলৌকিক হতে যাবে কেন? তাহলে তো কুইনাইন, পেনিসিলিন এসবকেও অলৌকিক বলে ধরতে হয়।''

''কিন্তু সেই ভদ্রমহিলা যে বললেন কাউরীবুড়ির কাছে বলি দেওয়া পশু বা পাখির রক্ত ছাড়া ও লতা বাঁচে না! আপনি আজ অবধি শুনেছেন এমন কোনো লতা যা রক্ত খেয়ে বাঁচে?''

''তুমি না আয়ুর্বেদের ছাত্র?'' মৃদু ধমক দিলেন কাকা, ''গাছগাছড়া নিয়ে এত কম জ্ঞান নিয়ে আয়ুর্বেদচর্চা করো কী করে? নেপেনথিস, মানে পিচার প্ল্যান্টের নাম শোননি? ভেনাস ফ্লাই ট্র্যানপ? রাউন্ডলিফ সানডিউ? গাছ পোকামাকড় খেতে পারে, আর রক্ত খেতে পারে না?''

দমে গেলাম। তাহলে তো সত্যিই সে লতা তুলে নিয়ে যাওয়ার উপায় নেই!

আড়চোখে আমার দিকে তাকালেন কাকা, তারপর বললেন, ''ভেঙে পড়ার কিছু হয়নি ভাইপো। তুমি স্বচ্ছন্দে ও লতা তুলে অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে চাষ করতে পারবে। ওর কোনো অসাধারণ ভেষজ গুণ থাকতে পারে বটে, কিন্তু ও নিরামিষাশী লতা। ওই বলির রক্তের গল্পটা ভাঁওতা।''

''কী করে বুঝলেন যে বলির রক্তের গল্পটা ভাঁওতা?'' সোজা হয়ে বসলাম চেয়ারে।

আমার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন কাকা, ''শুধু শুনে গেলে হবে ভাইপো, যেটা শুনলে সেটা তলিয়ে ভাববে না? এতক্ষণ অবধি যা যা শুনেছ, তার মধ্যেই তোমার প্রশ্নের লুকিয়ে আছে। একটু যুক্তি দিয়ে ভাবো দেখি।''

বলা বাহুল্য, অনেক ভেবেও কোনো কূলকিনারা করতে পারলাম না। কাকার কাছে আত্মসমর্পণ করতেই হল।

''মগলহানজামা যখন তাঁর মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যান, তার কত বছর পর ফিরে এসেছিলেন?''

''বেশ কয়েক বছর পর। তখন সঙ্গে তাঁর মেয়ে, দুই ছেলে আর দ্বিতীয় স্ত্রী।''

‘‘নিশ্চয়ই সেই বেশ কয়েক বছরের পরেই মগলহানজামা ওরফে আটন বসুমাতারি তাঁর মেয়েকে কাউরীবুড়ির মন্দিরে নিয়ে যান পুজো চালু করতে, তাই না?’’

‘‘নিশ্চয়ই তাই।’’

‘‘তাই যদি হয়, তাহলে ওই বেশ কয়েক বছর ওই পরিত্যক্ত মন্দিরে কে যেত কাউরীবুড়ির সামনে বলি দিতে? সেই ক’বছর কে বলির রক্ত গোলকপুষ্পের গোড়ায় ঢালত? অত বছর বলির রক্ত ছাড়া ও লতা বাঁচল কী করে?’’

হাত এঁটো না থাকলে তক্ষুনি কাকার পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়তাম তাতে সন্দেহ নেই। সাধে লোকটার ফ্যান আমি?

অর্থাৎ আমার আগের প্ল্যান বলবৎ রইল। এইখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে একবার কালিম্পং পৌঁছোনোর ওয়াস্তা, ব্যস! জয়ত্তারা, জয় কালিকে শ্মশানবাসিনী!

কাকা খেতে খেতে অন্যমনস্কভাবে বললেন, ‘‘অলৌকিক ওখানে নেই হে। অলৌকিক কিছু রয়েছে তোমার সদানন্দকাকার বাড়িতে, বুঝলে। খুব খারাপ কিছু একটা ঘটছে ওখানে, খুব খারাপ। মুশকিল হচ্ছে কাউরীবুড়ির ছায়া ওই বাড়িতে ঢুকল কেন বা কী করে, সেটা আমার মাথায় এখনও ঢুকছে না।’’

‘‘আপনিই তো বললেন আমি ওখানে গেছিলাম বলে...’’

‘‘উঁহুঁ, প্রথমে তাই ভেবেছিলাম বটে, কিন্তু এখন ভেবে দেখছি তা নয়। তাহলে তোমার যা ক্ষতি হওয়ার সেদিনই হয়ে যেত।’’

‘‘কিন্তু তাহলে...’’

‘‘তাহলে দুটোর মধ্যে কিছু একটা যোগ তো আছেই। কিন্তু সেই যোগটা যে কী সেটা বলতে পারছি না। তবে আমার গণনা বলছে আগামীকাল দুপুরের মধ্যে তার একটা সুরাহা না হলে তোমার, মাধুরীর, এমনকি সদানন্দবাবু ও তাঁর স্ত্রীর ওপরে মারাত্মক কিছু একটা হতে পারে।’’

আমি প্রথম দিন মাধুরীর হাত দেখে কী জানতে পেরেছিলাম সেটা বললাম কাকুকে। বৈধব্য যোগের কথাটাও জানালাম।

‘‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনির্বাণও হতে পারে।’’ অন্যমনস্কভাবে বললেন কাকা, ‘‘মোটমাট ও বাড়ির কারও একজনের গভীর প্রাণসংশয় আছে ভবতারণ। এবং সেটা বোধহয় আটকানো যাবে না।’’

বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। মনে পড়ল সকালে কাকুর বাড়ির উঠোনে আমার কবন্ধ ছায়াটার কথা।

‘‘উপায় কী কাকু?’’ ধরা গলায় জিজ্ঞেস করলাম। সকালের সেই ভয়ের অনুভূতিটা আবার আমার বুকের মধ্যে ফিরে আসছিল।

‘‘মাধুরীর স্বপ্নের সেই বৃদ্ধা মহিলা কে, সেটা যদি একবার জানা যেত’’, দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কাকা, ‘‘তাহলে হয়তো একটা চেষ্টা করলেও করা যেতে পারত। মুশকিল হচ্ছে যে টাইম কমে আসছে, কাল রাত্রের মধ্যেই যা করার করে ফেলতে হবে। এর মধ্যে কী করে...’’

‘‘কেন? কাল রাত্রের মধ্যে কেন?’’

‘‘কাল মহালয়া বলে।’’ হোটেলের বাইরে এসে মৌরি মুখে ফেলে বললেন কাকু, ‘‘পরাগ তোমাকে মহালয়ার দিনটার কথাই বলল কেন, সেটা ভেবেছ কখনও?’’

‘‘কেন কাকা?’’

‘‘কাল মহালয়া। পিতৃপুরুষদের উদ্দেশে তর্পণের দিন। যাঁরা একদিন অনেক রক্ত ঘাম কষ্টের বিনিময়ে আমাদের এই পৃথিবীর আলো দেখিয়েছিলেন, আমাদের বেঁচে থাকার একটা ন্যূনতম ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছিলেন, তাঁদের প্রতি ধন্যবাদ জানাবার দিন। কাল তাঁরা তাঁদের বাসস্থান ছেড়ে নেমে আসবেন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি, দেখে যাবেন তাঁদের রক্তের উত্তরাধিকারীরা কে কোথায় আছে, কেমন আছে। এই দিনেই যে পরাগ বসুমাতারি তার পূর্বপুরুষের বাসভূমিতে ফিরে যেতে চাইবে, তাতে আর সন্দেহ কী?’’

কথাটা শুনে একটা কথা মাথায় স্ট্রাইক করে গেল, ‘‘কাকা, আপনার এই মহালয়া আর পূর্বপুরুষদের কথা শুনে একটা কথা মনে পড়ে গেল। সেদিন খাওয়ার টেবিলে মাধুরী একটা বেশ ইন্টারেস্টিং গল্প বলেছিল বটে।’’

‘‘কী সেটা?’’

কাকাকে মাধুরীর দিদিমার কথাটা বিশদে বললাম। দিদিমার সাধন-ভজন, মাধুরীকে বলে যাওয়া যে ও ঈশ্বরকোটির মেয়ে, ওর মধ্যে ভৈরবীচিহ্ন আছে, ওর নামে করা বিশেষ যজ্ঞ, সেই যজ্ঞ থেকে পাওয়া মাদুলি, সব কথাই খুলে বললাম।

আমার কাঁধটা খামচে ধরলেন কাকা, ‘‘এসব কথা আমাকে আগে বলোনি কেন?’’

মাথা চুলকে বললাম, ‘‘আসলে খেয়াল হয়নি। এখন ওই মহালয়ার কথাটা বললেন বলে মনে পড়ল।’’

কাকা দ্রুত পায়ে বাইরে বেরিয়ে এদিক-ওদিক দেখে চেঁচিয়ে একটা রিকশা ডাকলেন। আমাকে বললেন, ‘‘রিকশায় ওঠো। এক্ষুনি সদানন্দবাবুর বাড়ি যেতে হবে। মাধুরীর সঙ্গে আমার কথা বলা প্রয়োজন, খুব প্রয়োজন।’’

* * * *

রাত বারোটা। আমার ঘরটার মাঝখানে একটা টেবিল এনে রাখা হয়েছে। তার চারদিকে চারটে চেয়ার। তিনটে চেয়ারের একটায় আমি, একটায় কাকা আর একটায় মাধুরী। অন্য চেয়ারটা ফাঁকা।

ঘরের দরজা-জানলা সব বন্ধ। মাথার ওপর ফ্যানটা অফ করে দেওয়া হয়েছে। অফ করে দেওয়া হয়েছে টিউবলাইটও।

ঘরের মধ্যে আলোর উৎস বলতে তিনটে মোটা মোমবাতি। মোমবাতিগুলো জ্বালিয়ে টেবিলের ওপরে রাখা। টেবিলের ওপর আরও কয়েকটা জিনিস রাখা। কয়েকটা ছোট বাটি, একটা তামার পাত্র, কয়েকটা শেকড়বাকড় ইত্যাদি।

কাকার বেশবাস এখন অন্যরকম। পরনে একটি লাল রঙের ধুতি। খালি গা। মাথায় একটি ছোট গেরুয়া কাপড়ের টুকরো ফেট্টির মতো করে বেঁধেছেন। কপালের একটি লাল টিকা, মোমবাতির আলোয় চকচক করে জ্বলছে সেটি।

কাকাকে যতই দেখছি ততই অচেনা লাগছে। আজ দুপুরে পরাগের ওখান থেকে ফিরে এসে মাধুরীর সঙ্গে বন্ধ ঘরে কীসব আলোচনা করলেন। তারপর উধাও হয়ে গেলেন কোথাও। বললেন যাচ্ছেন এক জায়গায়, উনি ফেরার আগে এ বাড়ির কেউ যেন এক পা-ও বাড়ির বাইরে না রাখে। উনি সন্ধে নাগাদ ফিরবেন। রাতে আমাকে আর মাধুরীকে ডিনার করতে বারণ করলেন।

কাকা ফিরেছেন ঘণ্টাখানেক আগে। দেখলাম স্নান করে এসেছেন। আমাকে আর মাধুরীকেও স্নান করে নিতে বললেন। বললেন রাতে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে আমাদের দুজনের। সেটা ঠিকঠাকভাবে সম্পন্ন না হলে নাকি আমাদের সবার সমূহ বিপদ!

এই সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ?

কাকা প্রথম কথা বললেন মাধুরীকে উদ্দেশ করে, ‘‘মাদুলিটা এনেছ?’’

মাধুরী মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

‘‘মাদুলিটা খুলে ফেলা তোমার উচিত হয়নি মা।’’

‘‘আসলে...আসলে দিভাই বললেন বলে...আমি তো বিয়ের পর মাদুলি পরেই গেছিলাম ও বাড়ি।’’

‘‘তাহলে খুললে কেন?’’

‘‘কী করব বলুন? দিভাই বললেন যে!’’

''কী বললেন দিভাই?'' টেবিলের ওপর একটু ঝুঁকে এলেন কাকা, ''কী করলেন? স্টেপ বাই স্টেপ বলে যাও।''

''স্টেপ বাই স্টেপ?'' প্রশ্নটা শুনে চোখ বন্ধ করে ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগল মাধুরী, ''ও বাড়ি গিয়ে বরণ-টরণ সব হল। তারপর বাড়িতে ঢুকে দিভাইকে প্রণাম করলাম। দিভাই আমাকে তুলে জড়িয়ে ধরতে গিয়েই কেমন একটু পিছিয়ে গেলেন। কিছু বললেন না। তারপর আমি যখন ঘরে ঢুকে মুখ-হাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে অন্য একটা শাড়ি পরে বসেছি, এমন সময় দিভাই ঘরে এলেন। বাকি সবাইকে ঘর থেকে বার করে দিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। হাতের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'এটা কী পরেছিস রে ভাই?'

বললাম, 'মাদুলি। আমার দিদুন মারা যাওয়ার আগে দিয়ে গেছিলেন।'

দিভাই তখন কিছু বললেন না। শুধু লক্ষ করলাম যে তারপর থেকে আমাকে একটু এড়িয়ে এড়িয়ে চলছেন। রাতের বেলা শুতে যাব, দেখি দিভাই ঘরে এলেন। একটা-দুটো কথার পর বললেন, 'তোকে একটা কথা বলি ভাই, সব ফ্যামিলির তো কিছু নিয়ম-টিয়ম থাকে। তা আমাদের বাড়ির নিয়ম হচ্ছে বাইরের কোনো মাদুলি তাগা তাবিজ এইসব না পরা, বুঝলি তো?' আমি তো বুঝিনি, বললাম, 'বাইরের বলতে?' তখন দিভাই বললেন, 'মানে এ বাড়িতে কারও কোনো মাদুলি, জলপড়া ইত্যাদির দরকার হলে আমিই ব্যবস্থা করে দিই। অন্য কারও বানানো মাদুলি-টাদুলি এই বাড়িতে ঢোকে না ভাই।' আমিও ভাবলাম, হবেও বা, কত বাড়িরই তো কত নিয়ম থাকে। তাই আমিও খুলে আমার ভ্যানিটি ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখলাম।''

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কাকা, বললেন, ''কর্ণ যদি কুরুক্ষেত্রে নামার আগেই তার কবচ-কুণ্ডল ফেলে আসে, তাহলে আর তাকে বাঁচায় কে? তা এখন মাদুলিটা সঙ্গে করে এনেছ তো?''

''হ্যাঁ এনেছি'', বলে সঙ্গের বটুয়ায়াটা থেকে মাদুলিটা বার করে টেবিলের ওপরে রাখতে গেল মাধুরী। কাকা সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে আটকালেন, ''এখন নয়, যখন বলব তখন।''

কাকা এবার সঙ্গের জিনিসগুলো নিয়ে কাজ শুরু করলেন।

প্রথমে যে জিনিসটা হাতে তুলে নিলেন, সেটা আমি খুব ভালো চিনি। ওটা শ্বেতবেড়েলার মূল। তারপর নিলেন কয়েকটা নিমকাঠের ডাল আর আমার অজানা কোনো গুল্মলতা, ফুল সহ।

তিনটি মোমবাতি একত্র করে তার আগুনের ওপর তিনটি একত্র করে ধরলেন। গোছাটা পুড়তে পুড়তেই একটা বাটি থেকে সামান্য চন্দনবাটা নিয়ে তার ওপর আঙুলের ছোঁয়ায় ছিটিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র মিষ্টি অথচ কড়া গন্ধে ঘরটা ভরে গেল।

এবার গোছাটা আগুন থেকে সরিয়ে আনলেন কাকা। তারপর মাথার দিকটা একসঙ্গে বাঁধলেন। এবার তিনটে বাটিতে রাখা তরলগুলো তামার পাত্রে ঢালতে লাগলেন।

''এগুলো কী কাকা?''

''শ্বেতসর্ষের তেল, ধনে ফুলের মধু আর রক্তচন্দন।''

তিনটে তরল ওই আধপোড়া গোছা দিয়ে বেশ করে ঘেঁটে নিলেন কাকা। তারপর একটা ছোট বেলকাঁটা বার করে মাধুরীর হাতে দিয়ে বললেন, ''তিন ফোঁটা রক্ত লাগবে মা।''

ভেবেছিলাম মাধুরী ইতস্তত করবে। তার বদলে বেশ স্মার্টলি কাঁটাটা নিয়ে আঙুলে ফোটাতে উদ্যত হল।

''আঙুলের রক্ত নয় মা। বুকের।''

এবার থমকাল মাধুরী। একবার কাকার দিকে, একবার আমার দিকে তাকাল। চোখ বন্ধ করল মুহূর্তের জন্য। তারপর বাঁদিকে খানিকটা ঘুরে গিয়ে শাড়ির আঁচলটা সরিয়ে বাম স্তনের ঠিক ওপরে কাঁটাটা ফুটিয়ে দিল।

আমি স্বভাবতই মাথাটা নীচু করে ফেলেছিলাম। কাকার দেখলাম কোনো বিকার নেই। সহজ অথচ গম্ভীর স্বরে বললেন, ''বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে এক এক করে ঠিক তিনটি ফোঁটা রক্ত এই মিশ্রণের মধ্যে ফ্যালো মা।''

আমার ঠিক চোখের সামনে ছিল তামার পাত্রটা। দেখলাম মাধুরীর চাঁপাকলির মতো আঙুল থেকে তিনবার তিনটি রক্তবিন্দু মিশে গেল সেই মিশ্রণে।

চোখ বুজলেন কাকা। তারপর গম্ভীর স্বরে আবৃত্তি করলেন,

"ওঁ চামুণ্ডে শ্মশানকালিকে রক্তবর্ণা ত্রিনয়না।
ভূতাদি প্রেতাদি সঙ্গা মহারত পরায়ণা।।
প্রসীদ প্রসীদ দেবীভূত্যাস্তবম্মকান্।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা দেবি সিদ্ধি সর্বত্র দেহি মে।"

আগে কখনও কাকাকে এইভাবে দেখিনি। আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল।

এইবার কাকা আধপোড়া গোছাটা মিশ্রণে ডুবিয়ে টেবিলের ওপর একটা একটা অদ্ভুত জ্যামিতিক নকশা আঁকলেন। নকশাটা দেখতে অনেকটা স্টার অফ ডেভিডের মতো, তফাত হচ্ছে যে এতে ছটার বদলে পাঁচটা মাথা। সেই পাঁচটা মাথা ছুঁয়ে একটি বৃত্ত। সেই বৃত্তটিকে বেষ্টন করে আরও একটি বৃত্ত। এবার ওই পঞ্চমুখী তারার পাশাপাশি দুটি মাথা থেকে সমদূরত্বে দুই বৃত্তের মাঝখানে পাঁচটি ফোঁটা আঁকলেন। সবশেষে একটি চতুর্ভুজ আঁকলেন কেন্দ্রস্থলে।

আমি আর মাধুরী এতক্ষণ কাকার কাজকর্ম দেখছিলাম, কিছু বলিনি। আমাদের মধ্যে মাধুরীই প্রথমে জিজ্ঞাসা করল, "এটা কী কাকামশাই?"

কাকা বললেন, "এর নাম চণ্ডকাত্যায়নীচক্র মা। আজ আমি এই চক্রের মাধ্যমে এইখানে তোমার দিদিমার আত্মাকে আহ্বান করব। কাল মহালয়া। এই সময়ে আমাদের পূর্বসূরিরা এই জড়জগতের সবচেয়ে কাছাকাছি থাকেন। এই পুণ্যলগ্নে আমি সেই মহীয়সী সাধিকাকে আহ্বান জানাব আমাদের মার্গনির্দেশের জন্য, আমাদের অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করার জন্য।"

"কিন্তু তার জন্য এসব..."

"এই কাত্যায়নীচক্রসাধন অতি গূঢ়, অতি গুহ্যবিদ্যা মা। এই পৃথিবীতে মাত্র গুটিকয় সাধক এর প্রয়োগ জানেন। তোমার দিদিমা ছিলেন মহাসাধিকা, মহাযোগিনী। তাই কোনো সাধারণ চক্রাধার তাঁর আত্মার বিপুল বেগ ধারণ করতে সক্ষম নয়।"

"কিন্তু কেন কাকামশাই? মানে এসব করে কী হবে?"

মাধুরীর দিকে তাকালেন কাকা। বললেন, "মা, তুমি যে এখনও অবধি বেঁচে আছ সে তোমার ওই দিদুনের কৃপায়। নিজের মৃত্যু আসন্ন জেনে সেই মহাসিদ্ধযোগিনী তাঁর অলৌকিক বিভূতির খানিকটা তোমায় দিয়ে গেছিলেন, তারই জোরে তুমি এখনও নিঃশ্বাস নিতে পারছ মা। সেদিন মহাধর্মনাশের হাত থেকে তিনিই তোমাকে বাঁচিয়েছেন। নইলে তুমি যে সংকটের মধ্যে পড়েছ, এক মৃত্যু ছাড়া তার থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব।"

কাকার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোমবাতির শিখাগুলো যেন একবার লাফিয়েই স্থির হয়ে গেল। আর আমার ঘাড়ের ঠিক কাছে কে যেন ঠান্ডা ফুঁ দিল একটা। আমার সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে উঠল। আড়চোখে তাকিয়ে দেখি মাধুরীও যেন ভয় পেয়েছে কিছুটা।

কাকা লক্ষ করলেন সেটা। তারপর বললেন, "দুজনকেই বলে রাখি, এই চক্রসাধনপথে কিন্তু মহাবিঘ্নভয় উপস্থিত হবে। যে অপশক্তি এ বাড়ির আনাচেকানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে কিন্তু অত্যন্ত ক্রূরকর্মা, অত্যন্ত শক্তিশালী। সে সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে যাতে আমরা সফল না হই। তাহলেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ। এই সময় তোমরা নিজের সাহস বজায় রাখবে। কোনোমতেই বুদ্ধিভ্রষ্ট হবে না, তাহলেই কিন্তু মহা সর্বনাশ। মাধুরী মা, এইবার তোমার দিদুনের দেওয়া মাদুলিটা নিয়ে এসো। এই চক্রের মাঝখানে যে চতুর্ভুজটি আছে, তার মধ্যে রাখো।"

মাধুরী ওর মুঠোটা টেবিলের ওপর আনতেই হঠাৎ করে একটা দুম করে আওয়াজ। মনে হল কে যেন আমাদের ঘরের ছাদের ওপর বড় ইট বা পাথর ছুড়ে মারল একটা।

মাধুরী থমকে গেছিল। কাকা দৃঢ়স্বরে বললেন, ''নিজের মনোযোগ বিঘ্নিত হতে দিও না মা। আজ উন্মত্তভৈরব স্বয়ং আমাদের রক্ষা করবেন। যা বলছি সেটা করো।''

মাধুরী ধীরে ধীরে মাদুলিটা ওই নকশার মধ্যিখানে নিয়ে যেতে শুরু করতেই মনে হল ঘরের চারিপাশে যেন তাণ্ডব শুরু হয়েছে। দরজা-জানলাগুলো বিপুলভাবে কাঁপতে লাগল। সারা ছাদ জুড়ে কেউ যেন হাতুড়ি পিটছে উন্মত্তের মতো। ইতিমধ্যেই আমার হাত-পা কাঁপছে, কানের পাশ দিয়ে গড়াচ্ছে গরম ঘামের ফোঁটা, পেটের মধ্যেটা ফাঁকা। সমানে গুরুমন্ত্র জপে যাচ্ছি।

মাধুরীকে দেখে বুঝলাম তারও অবস্থা আমার থেকে খুব বেশি ভালো না। কেবলমাত্র মনের জোরে সে তার ক্রমাগত কাঁপতে থাকা হাতটা নিয়ে যাচ্ছে নকশার দিকে।

মাধুরীর মুঠোটা ঠিক চণ্ডকাত্যায়নীচক্রের মধ্যিখানে পৌঁছেছে, ঠিক সেই সময় সবকিছু হঠাৎ করে থেমে গেল। কোথাও কিছু নেই। চারিদিকে অপার পাথুরে স্তব্ধতা।

তারপর শব্দটা শুরু হল। শুরু হল ধীরে ধীরে। মনে হল দরজার ওপর ধারালো নখ দিয়ে কে যেন আঁচড়াতে শুরু করেছে। একটা ভয় ধরানো ক্যাররররর আওয়াজ ধীরে ধীরে হিংস্র শ্বাপদের মতো আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকল অনিবার্য নিয়তির মতো।

মাধুরীকে মনে হল চেয়ার থেকে পড়ে যাবে এবার। হাতটা থরথর করে কাঁপছে। চাইলেও মুঠোটা খুলতে পারছে না। আমি উঠতে যাচ্ছিলাম সাহায্য করব বলে। কাকু হাত দেখিয়ে বারণ করলেন। মাধুরীকে আদেশ করলেন, ''মাদুলিটা ওখানে রাখো মা।''

অনেক চেষ্টা করে মাধুরী হাতের মুঠো খুলে মাদুলিটা চক্রের মধ্যে রাখল, ঠিক সেই সময় দরজার বাইরে কে যেন গম্ভীর আর কর্কশ স্বরে ডেকে উঠল একবার, 'ক্রা ক্রা'।

মাধুরী অস্ফুটে বলল, ''সেই লোকটা!''

কাকু আমল দিলেন না। বললেন, ''তোমার দুই বুড়ো আঙুল এই তারার দুটি শীর্ষবিন্দুতে রাখো মা। আর তোমার দিদুনের কথা ধ্যান করো। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে, সমস্ত সত্তা দিয়ে, সমস্ত চৈতন্য দিয়ে।''

আমাকে বললেন, ''ডানহাতে পইতেটা জড়িয়ে মনে মনে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করো। একটি শব্দও যেন ভুলভাবে উচ্চারিত না হয়। তাহলে কিন্তু অনর্থ হয়ে যাবে।''

এবার কাকা তাঁর নিজের তর্জনী দুখানি সেই চণ্ডকাত্যায়নীচক্রের দুটি শীর্ষবিন্দুতে স্থাপন করলেন। আর একটি মাত্র শীর্ষ অস্পর্শিত রইল।

সেটি চতুর্থ ফাঁকা চেয়ারটির দিকে নির্দিষ্ট।

চোখ বন্ধ করলেন কাকা। গম্ভীরস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করলেন,

'ব্যোমবক্ত্রম মহাকায়ং প্রলয়াগ্নিসমপ্রভম্।
অভেদ্যভেদকং স্তৌমি ভূতডামর-নামকম্।।
আদিবীজং সমুধৃত্য ততো রুদ্রভয়ংকরী,
অট্টহাসিনি সাধকপ্রিয়ে পদ্মুদ্ধরেৎ...''

অনেক দূর থেকে একটা শোঁ শোঁ আওয়াজ কানে আসছিল। এবার মনে হল আওয়াজটা যেন ক্রমেই বাড়ছে। মনে হচ্ছে কোনো এক বিশাল দৈত্য ক্রুদ্ধভাবে দৌড়ে আসছে আমাদের দিকে। তার হুংকারে কান পাতা দায়— কড়কড়কড়াৎ করে একটা বাজ পড়ল কাছেই। কয়েক সেকেন্ড বাদে তার বিস্ফোরণের শব্দটা আমাদের কানে আছড়ে পড়তেই শুরু হয়ে গেল ঝড়ের দাপট। দরজা-জানলাগুলো ছটফট করতে লাগল

পাগলের মতো। ঘরের চারিদিকে মনে হল প্রলয়মাতন লেগেছে। ঘন ঘন বজ্রপাত আর ঝড়ের অট্টহাসির জেরে কান পাতা দায়।

আমার বুকের মধ্যে কে যেন দুরমুশ পিটছে। তবুও আমি চোখ বন্ধ করে একমনে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলাম। ওদিকে কাকা উচ্চারণ করে চলেছেন,

''বিষমুদ্ধৃত্যাপি সুরতপ্রিয়ে দিব্যলোচনি।
কামেশ্বরী জগন্মোহিনী ততশ্চ সুভগে পদম।
ততঃ কাঞ্চমালেতি ভূষণীতি পদং বদেৎ।
ততো নূপুরশব্দেন প্রবিশদ্বয়মুদ্ধরেৎ...''

ওদিকে বাইরে প্রলয়ের তাণ্ডব বেগ ক্রমশ উর্ধ্বমুখী। মনে হচ্ছে কোনো বিপুল বলশালী দৈত্য যেন বুলডোজার দিয়ে বাড়িটা গুঁড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমি মন্ত্র জপ করে যাচ্ছি বটে, কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারছি আমার হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। যে-কোনো মুহূর্তে আমি মন্ত্র ভুলে যেতে পারি।

এমন সময় একটা অজানা গন্ধ আমার নাকে এল। ঘি, কর্পূর, ধূপধুনো, গুগ্গুল মেশানো একটা সুবাস। তার সঙ্গে একটা অজানা ফুলের গন্ধ।

কাকা চাপা গলায় বললেন, 'ব্যস।'

চোখ খুললাম। তিনটি মোমবাতির আগুনই নিভু নিভু প্রায়। ঘরের মধ্যে কে যেন একটা ছায়া ছায়া অন্ধকারের চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। আমি কাকা আর মাধুরীর শুধু অবয়ব দেখতে পাচ্ছি। আর দেখতে পাচ্ছি আরও একটা জিনিস।

চণ্ডকাত্যায়নীচক্রের পঞ্চম শীর্ষবিন্দু ছুঁয়ে আছে আঙুলের মতো কীসের যেন একটা ছায়া!

লক্ষ করলাম বাইরের ঝড়ের তাণ্ডব একেবারে স্তব্ধ। কোথাও কোনো একটা পিন পড়ারও আওয়াজ নেই। কিছু একটা ঘটার প্রত্যাশায় ঘরের নৈঃশব্দ্য যেন অধীর আগ্রহে কাঁপছে।

স্তব্ধতা বন্ধ করে প্রথম কথা বললেন কাকা, চাপা অথচ স্পষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, ''মা, আপনি এসেছেন?''

যেন কোন অতল গহ্বর থেকে থেকে এক ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর ভেসে এল, ''আহ...বড় কষ্ট...বড় কষ্ট...কেন...কেন ডাকলে আমায়...''

''আপনার নাতনির জীবন আজ বিপন্ন মা। নইলে আপনাকে জীবস্তরে ডেকে আনার ধৃষ্টতা করতাম না, সন্তানের অপরাধ ক্ষমা করুন।''

''আমি তো বলেছিলাম...ও সিঁদুর পরিসনে মেয়ে...বলেছিলাম ও সিঁদুর অলুক্ষুণে...বারণ...বারণ করেছিলাম...ও মেয়ে আমার বারণ শোনে না কেন... আমার কথা শোনে না কেন...''

''দিদুন...দিদুন...তুমি সত্যি এসেছ দিদুন...''

''নিষেধ শুনিস না কেন মা...ও মাদুলি কেন খুললি...ও শয়তানির দেওয়া অমঙ্গলমূর্তি কেন রাখলি ঘরে...''

''ও কীসের মূর্তি দিদুন?''

''ও মূর্তি ঘোর পাতালের অভিশাপ...ও বিদ্বেষনাগিনীর মূর্তি...ওই মূর্তি যার ঘরে থাকে তার সবকিছু ছারখার করে দেয়...তাকে তিল তিল কষ্ট দিয়ে নাশ করে...''

''কিন্তু কেন মা? কে ওর অমঙ্গল চাইছে? আর কেন?'' এবার কাকা প্রশ্ন করলেন।

''শোন রে মেয়ে...তোর ভালোবাসার মানুষের ওপর নজর পড়েছে কালনাগিনীর...সে তার নিজের সহোদরা...তার অতৃপ্ত যৌবন কুরে কুরে তুলে এনেছে উগ্র কামবাসনার গরল। সে তোকে তোর শত্রু মনে করে...সে চায় তার পথের কাঁটাকে উপড়ে ফেলতে।''

''কিন্তু কেন দিদুন...কেন?''

''সে পাপিনীর রক্তের সম্পর্কের বোধ নেই...এতই তীব্র তার অতৃপ্ত কামনার আগুন। কিন্তু তাকে দুর্বল বলে ভাবিসনি মেয়ে...সে বড় শক্ত ঠাঁই...সেই পাপিষ্ঠা পারে না হেন সিদ্ধাই নেই...সে চাইছে তোর ধর্মনাশ হোক, তোর সর্বনাশ হোক, তোর প্রাণনাশ হোক...''

''দিদুন...দিদুন...সেদিন তুমিই আমাকে বাঁচাতে এসেছিলে দিদুন?''

দেখতে পাচ্ছি না বটে, তবে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম মাধুরী কাঁদছে।

''আহ...বড় মায়া...বড় কষ্ট...ওরে আমার ঈশ্বর যে আমার ভৈরবীচক্র তোর বুকেও এঁকে দিয়েছেন রে মেয়ে...তুই যে আমারও অংশ...তোর বিপদ দেখে আর ঠিক থাকতে পারি?...আহা...বড় মায়া রে মেয়ে...বড় মায়া...আহ...''

বুঝতে পারছিলাম যে যিনি এসেছেন তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে এখানে থাকতে। মোমবাতির শিখাদুটো এখন একদম নিভে গেছে।

''শোন রে মেয়ে...কাল অমাবস্যার রাতে ওই নাগিনী তোর প্রাণের মানুষকে নিয়ে বসবে যক্ষিণীচক্রে। যে করেই হোক সেই চক্রসাধন আটকা...নইলে তোর মহাসর্বনাশ হবে রে মেয়ে...চিরকালের জন্য হারাবি তোর সবকিছু...''

''কীভাবে মা? কী করে? কোন পথে আটকাব এই অনর্থ?''

''কর্মের ফল সবাইকেই ভুগতে হয় বাবা'', আওয়াজটা ক্রমেই মিলিয়ে আসছিল, ''ওই শয়তানি যে মহাবিষ মিশিয়েছে আমার বাছার সিঁদুরে, সেই বিষই তার কাল হবে...''

''কোথায় মা...কোথায় হবে এই যক্ষিণীচক্র?''

সেই অলৌকিক স্বর নিভে এসেছে প্রায়, ''মন্দিরে যাস বাবা...বিলের ধারে গভীর জঙ্গলের মধ্যে আছে ওই নাগজাতির আরাধ্যা দেবীর মন্দির, সেখানে যাস...সেখানেই হবে ওই যক্ষিণীচক্র।''

আমি শোনামাত্র স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কাউরীবুড়ির মন্দিরে? কেন? ওইখানে কেন?

এবার কাকাও মনে হল একটু বিচলিত হলেন এই উত্তর শুনে, ''কিন্তু... কিন্তু...মা...ওখানে কেন? ওই মন্দিরের সঙ্গে কী সম্পর্ক এই কালনাগিনীর? আর ওই শয়তানি অমন জটিল চক্রসাধন করার মতো এমন অলৌকিক শক্তি পেলই বা কোথা থেকে?''

অনেক দূর থেকে ভেসে আসতে আসতে মিলিয়ে গেল সেই স্বর, ''ওর রক্তে আদিম নাগজাতির উপাসনার উত্তরাধিকার বইছে যে বাবা...অনেক হাজার বছরের উত্তরাধিকার...ও যে পাতরগোঁয়্যাদের বড়দেওরি...''

* * * *

আমরা এসেছি মাগুরি বিলের ধারে। পুরোপুরি সন্ধে হয়নি এখনও। থকথকে অন্ধকার নেমে আসছে চারিধারে। তারই মাঝে শান্ত হয়ে শুয়ে আছে এই বিস্তীর্ণ জলাশয়। চারিধারে উজনি আসামের ঘন জঙ্গল। হ্রদের বুকে উঁকি মেরে নিজের মুখ দেখছে ঘোর অন্ধকার মেঘলা আকাশ। আর একটু পরেই আমরা ঢুকে পড়ব জঙ্গলের ভেতর, কাউরীবুড়ির মন্দিরের দিকে।

এখন আমি জানি যে কাউরীবুড়ির মন্দিরে আমার সঙ্গে দেখা হওয়া মহিলাই মাধুরীর দিভাই। বিধবা মহিলা তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত। যৌন ঈর্ষায় জর্জরিত হয়ে মাধুরীকে তিনিই একটু একটু করে ঠেলে দিচ্ছিলেন নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে। হয়তো বা তার পরিবারের বাকিদেরও।

আমরা বলতে আমি, কাকা আর পরাগ। আমার আর পরাগের পরনে শার্ট-প্যান্ট, কাকার ধুতির রং গেরুয়া, ঊর্ধ্বাঙ্গে একটা উড়নি।

কাকা আমাদের দুজনকে আদেশ দিলেন, ''যাও স্নান করে এসো।''

মাগুরি বিলের কনকনে ঠান্ডা জলে পা দিতেই সারা শরীরে একটা শিহরন খেলে গেল। সেই গভীর নির্মম শৈত্য আমার পা থেকে কোমর অবধি অসাড় করে দিল প্রথমে। কেঁপে উঠলাম খানিকটা। তারপর মন শক্ত করে ডুব দিলাম জলের মধ্যে।

সকালে উঠতে দেরি হয়েছিল বেশ। কাল রাতের কথা সদানন্দকাকুদের বলা হয়নি, কাকার বারণ ছিল। শুধু একবার গতরাতের ঝড়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করাতে কাকু আশ্চর্য হয়ে বললেন, ''কই, কোনো ঝড়বৃষ্টি হয়নি তো কাল!''

আমার ওঠার আগেই দেখি কাকা আমার ঘরের বাইরে একটা চেয়ারে বসে চা খাচ্ছেন। আশ্চর্য মানুষ বটে! কাল অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি থাকলেন না এই বাড়িতে! কাকুর সাইকেলটা নিয়ে ওই গভীর রাতেই চলে গেলেন নিজের ডেরায়। ভদ্রলোক আমার কাছে সারাজীবন এক রহস্যই রয়ে গেলেন।

আমাকে বললেন, ''ঝটপট রেডি হয়ে নাও ভবতারণ, আজই সেই দিন। অনেক কাজ আছে।''

বেরোতে বেরোতে প্রায় নটা। স্নান করে জামাটা গলিয়ে বেরিয়ে দেখি বাড়ির সামনে দুটো মোটরবাইক, একটায় মংকু, আরেকটায় পরাগ। আমাকে দেখে মংকু একগাল হাসল। পরাগের চোখে একটা বেখাপ্পা সাইজের রোদচশমা, তাতে তার মুখের ভাব বোঝা দায়।

কাকা দেখলাম একটু পরে বেরোলেন। জিজ্ঞেস করলাম, ''কোথায় ছিলেন?''

''মাধুরীর কাছ থেকে একটা জিনিস নেওয়ার ছিল।''

''তা এখন আমরা কোথাও যাচ্ছি নাকি কাকা?''

''হুঁ'', সংক্ষিপ্ত উত্তর।

''কোথায়?''

''গেলেই দেখতে পাবে।'' বলে কাকা পরাগের বাইকে সওয়ারি হলেন। আমি মংকুর বাইকে চড়ে বসলাম।

গেলাপুখুরি থেকে আসাম ট্রান্সপোর্ট রোড ধরে তিনসুকিয়ার টাউনে পৌঁছোতেই সময় লাগল প্রায় আধঘণ্টা, রাস্তায় এত জ্যাম। যেখানে পৌঁছোলাম সে জায়গাটার নাম মাকুম। সেখান থেকে একটা রাস্তা চলে গেছে দক্ষিণের দিকে, ওই রাস্তা ধরে ডিগবয় যাওয়া যায়। আমরা সেই রাস্তাটা নিলাম না। আসাম ট্রান্সপোর্ট রোড ওখান থেকে উত্তরে বেঁকে সোজা চলে গেছে অরুণাচল প্রদেশের দিকে। আমরা ধরলাম সেই রাস্তাটা।

খানাখন্দভরা রাস্তা ধরে মিনিট চল্লিশ চলার পর যে জায়গাটায় এসে নামলাম, সেটা একটা বাজার। অতক্ষণ বাইকে বসে কোমরটা টাটিয়ে গেছিল। বাইক থেকে নেমে কোমরটা ছাড়িয়ে নিতে নিতে ভাবছিলাম পরাগ বা কাকাকে জিজ্ঞাসা করব কোথায় এলাম। তার আগেই সামনের চায়ের দোকানের মাথায় সাইনবোর্ডে চোখ গেল, দেখলাম লেখা আছে, ''ডুমডুমা বাজার।''

জায়গাটার নাম শুনে মনে হল আমি নামটা শুনেছি, কিন্তু কখন বা কোথায় সেটা ঠিক মনে পড়ল না। এদিকে পরাগ এগিয়ে গেছে চায়ের দোকানের দিকে, চারটে চায়ের অর্ডার দিয়েছে।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে কাকা পরাগকে জিজ্ঞেস করলেন, ''আসবে তো?''

''একদম আসবে স্যার।''

''পালটি খাবে না তো? তুমি শিওর?''

''হান্ড্রেড পার্সেন্ট আসবে স্যার। পরাগ বসুমাতারি কাঁচা কাজ করে না।''

''কী বলে রাজি করালে শুনি?'' কাকা চোখটা কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, ঠোঁটের কোনায় একটা হাসির আভাস।

''রাজি করাতে বেশি কষ্ট হয়নি স্যার। সে মক্কেল তো হাঁসফাঁস করছিল প্রায়। আপনার কথা খুলে বলতেই...তবে কষ্ট হয়েছে খুঁজে পেতে। বহুত হুজ্জোত গেছে স্যার।''

''পেলে কোথায়? বাড়িতেই ছিল না অন্য কোথাও?''

"বাড়িতেই। এই চার-পাঁচ মাস প্রায় গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছিল।"

"হুম, সেরকমই আন্দাজ করেছিলাম। তা খুঁজে পেলে কী করে?"

"হে হে হে...ওটা নাহয় সিক্রেটই থাক স্যার। এককালে তো এই এলাকাতেই বাস ছিল আমাদের, কিছু যোগাযোগ তো আছেই।"

এইবার মনে পড়ে গেল ডুমডুমা নামটা আগে কোথায় শুনেছি। পরাগ বসুমাতারির পূর্বপুরুষেরা আগে এই গ্রামেই থাকতেন বটে! কিন্তু এখন এখানে কেন আমরা?

বিষয়টা মাথায় ঢুকছিল না। সকাল সকাল এতটা রাস্তা উজিয়ে কেনই বা এখানে এলাম, আর কে-ই বা গৃহবন্দি ছিল, কার সঙ্গে দেখা করার কথা হচ্ছে, সেটা বুঝতে পারছিলাম না।

চা খেয়ে উঠে দাঁড়ালেন কাকা, পরাগকে বললেন, "একবার খোঁজ নাও পরাগ, দ্যাখো এসেছে কি না।"

এতক্ষণ খেয়াল করিনি, চায়ের দোকানের পাশেই একটা ফোন বুথ। পরাগ সেখানে ঢুকে কাকে একটা ফোন করল যেন। তারপর বাইরে বেরিয়ে চাপা উত্তেজনার সঙ্গে বলল, "এসে গেছে স্যার। চলুন।"

এবার মেন রোড ছেড়ে একটা কাঁচা রাস্তা ধরলাম। একটু এগোতেই দেখি একটা পাড়ার মধ্যে ঢুকছি। হুবহু পরাগদের পাড়াটার মতো, শুধু আরেকটু ভদ্র গোছের, এই যা।

মিনিট পাঁচেকের বাইক রাইডের পর একটা বাড়ির সামনে বাইকটা স্ট্যান্ড করে উচ্চৈঃস্বরে কাকে একটা ডাকল পরাগ। একটু পরেই একটি অল্পবয়সি মেয়ে বেরিয়ে এল। দেখেই স্পষ্ট বোঝা যায় পরাগের স্বজাতি। মেয়েটির মুখে একটা আলগা ভয়ের ভাব, পরাগকে দেখে হাসলেও সেটা লুকোনো গেল না।

পরাগ কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে মেয়েটি ভেতরের দিকে ইঙ্গিত করল। পরাগ আমাদের দিকে ঘুরে একটু চাপা গলায় বলল, "আসুন।" মংকুকে বলল, "তুই এখানেই থাক, পাহারা দে।"

বাড়ির ভেতর ঢুকে বুঝলাম মোটামুটি পয়সাওয়ালা লোকের বাড়ি। টিভি ফ্রিজ টেলিফোন সবই আছে। বসার ঘর থেকে ভেতরের দিকে যেতে যেতে কাকা চাপাস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "এ কাদের বাড়ি পরাগ?"

পরাগ একটু লাজুকস্বরে উত্তর দিল, "আমার হবু শ্বশুরবাড়ি।"

ওরেশালা! ব্যাটা এইখানে বিয়ের কথা দিয়ে ওদিকে শিলিগুড়ির ডান্সগার্লের সঙ্গে আশনাই করে বেড়াচ্ছে? মহা খলিফা ছেলে তো!

ভাবতে ভাবতেই দেখি একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল পরাগ। দরজাটা ভেজানো। সেটা ঠেলে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "আসুন।" তিনজনে ঢুকে পড়লাম ।

ঘরের ভেতরটা বেশ অন্ধকার, চোখ সইতে একটু সময় নিল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বুঝলাম এটা বোধহয় বাড়ির এক্সট্রা ঘর, প্রয়োজনে ভাঁড়ারঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সারা ঘরে একটাই জানলা, যেদিক দিয়ে ঢুকলাম তার ঠিক উলটোদিকে। এখন অবশ্য ঘরে জিনিসপত্র ডাঁই করা নেই। তার বদলে যেটা আছে সেটা হচ্ছে জানলার ঠিক সামনে রাখা একটা টেবিল, তার ওপাশে একটা চেয়ার আর চেয়ারে বসে থাকা একটা মানুষ!

আমাদের ঘরে ঢুকতে দেখে লোকটা একটু নড়ে উঠল, কাঁপা কাঁপা স্বরে প্রশ্ন করল, "পরাগ, পরাগ...উনি এসেছেন?"

পরাগ আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল, "হ্যাঁ দাদা, উনি এসেছেন, একদম চিন্তা করবেন না। এবার সব ঠিক হয়ে যাবে।"

সেই অল্পবয়সি মেয়েটি এসে তিনটি চেয়ার দিয়ে গেল ঘরের মধ্যে, দরজা বন্ধ করার আগে পরাগকে বলে গেল, "বেরোবার আগে আমাকে একবার ডেকে নেবেন কিন্তু।"

পরাগ গিয়ে জানলাটা খুলে দিল, আর বাইরে থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া আলোয় টেবিলের ওপারে বসা লোকটাকে দেখে প্রচণ্ড চমকে উঠলাম আমি। পরশু এই ছোঁড়াকেই সদানন্দকাকুর বাড়ির সামনে উঁকিঝুঁকি দিতে দেখেছিলাম না?

তবে আমার অবাক হওয়ার আরও বাকি ছিল। কাকা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে লোকটার সামনে বসে প্রশ্ন করলেন, ''আপনার শরীর ভালো আছে তো অনির্বাণবাবু?''

নামটা শুনে মনে হল কে যেন আমার বুকে একটা ঘুসি মারল। অনির্বাণবাবু? এই তাহলে অনির্বাণ চৌধুরী? মাধুরীর স্বামী?

একটা দুরন্ত ক্রোধ, একটা অবর্ণনীয় অক্ষম ঈর্ষা আমার শরীরের বাঁদিক থেকে জ্বলতে জ্বলতে মাথার ওপরের দিকে উঠতে লাগল। এই সেই হারামজাদা, যে নিজের দিদির সঙ্গে শুয়ে, যৌবনের সমস্ত মস্তি লুটেও একটা নিষ্পাপ মেয়ের জীবন নষ্ট করেছে। এই সেই শুয়োরের বাচ্চা, যার পারিবারিক সম্পর্কের বোধ নেই, অন্য কারও জীবনের প্রতি মায়া নেই, বিছানায় মেয়ে তোলার ক্ষেত্রে বাছবিচার নেই। এই পারভার্ট জানোয়ারটাকে...

একটা থরথরে ভয়ার্ত স্বরে উত্তর ভেসে এল, ''আ...আমি..আমি ভালো নেই...আমি ভালো নেই...আ...আমি..আমি বাঁচতে চাই...আমি পালাতে চাই এসব থেকে...''

কাকা একটু সামনে ঝুঁকে লোকটার দুটো হাত ধরে ফেললেন, ''আমি জানি অনির্বাণবাবু, কী ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আপনি যাচ্ছেন। না জানলেও অন্তত আন্দাজ করতে পারি। সেইজন্যই কাল পরাগকে বলেছিলাম যে করে হোক আপনার খোঁজ করতে। আমার আশঙ্কা ছিল যে আপনাকে হয়তো এই ক-মাস কড়া পাহারায় রাখা হয়েছে। এবার আপনার গল্পটা বলুন তো। তার ওপরেই অনেকগুলো জীবন নির্ভর করছে।''

টেবিলের ওপর এক গ্লাস জল রাখা ছিল। এক চুমুকে পুরো জলটা শেষ করল ছেলেটা। কিছুক্ষণ থম মেরে বসে রইল। তারপর নীচু স্বরে বলতে শুরু করল।

''আপনারা জানেন কি না জানি না, আমার বাবা কলকাতার বাঙালি হলেও, মা ছিলেন এখানকার লোক। বাবা সত্তরের দশকে একটা কাঠচেরাই কলের ম্যানেজারির দায়িত্ব নিয়ে চলে আসেন। মায়ের সঙ্গে আলাপ এখানেই, বিয়েও এখানেই। বাবা আর কোনোদিন কলকাতা ফিরে যাননি।

আমার মা ছিলেন দাপুটে মহিলা। একবার বাবার এক কলিগ বাবার চরিত্র নিয়ে কিছু একটা মিথ্যে গুজব রটায়। কথাটা হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে মায়ের কানে আসে। মা জানতেন যে রটনাটা আদ্যন্ত মিথ্যে, তিনি ঘাস কাটার হেঁসো হাতে সেই কলিগের বাড়িতে চড়াও হন। সেযাত্রা মায়ের হাতে-পায়ে ধরে তারা রক্ষা পায়। রেগে গেলে মা সাক্ষাৎ রণচণ্ডী হয়ে যেতেন। একমাত্র বাবা ছাড়া আমার মা কাউকে খুব একটা রেয়াত করতেন না। বাবাকে ভালোওবাসতেন খুব। জন্মের পরে দেখেছি মা আমাদের সংসারটাকে দাঁড় করাতে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। বাবার একটু খরুচে বাই ছিল। মা-ই যতটা পারতেন সামলাতেন।

আমি যবে থেকে বড় হতে শুরু করলাম, লক্ষ করলাম যে আমাদের বাড়িতে এমন কিছু কিছু ঘটে যা অন্য কারও বাড়িতে হয় না। বিষয়গুলো দেখে খুব অদ্ভুত লাগত আমার। যেমন ধরুন, মা প্রতি মাসেই এক-দু'দিন সারাদিনের জন্য কোথায় যেন উধাও হয়ে যেতেন। মানে ভোরে বেরোতেন, ফিরতেন রাত করে। কোথায় যেতেন, কী করতেন কেউ জানত না, এমনকি বাবাও না। এই কথাটা আমাদের পরিবারের মধ্যেই কঠোরভাবে গুপ্ত ছিল, বাইরের কেউ আঁচ পেত না। মায়ের কড়া আদেশ ছিল, এ কথা যেন ঘুণাক্ষরেও বাইরে না যায়।

আমার দ্বিতীয় খটকা লাগে যখন বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি খেলতে গিয়ে লক্ষ করলাম যে, আমাদের বাড়িতে পুজো হওয়া মূর্তিগুলোর সঙ্গে অন্যান্য বাড়ির মূর্তিগুলোর কোনো মিলই নেই। আমাদের মূর্তিগুলো সাধারণ হিন্দু দেবদেবীর মূর্তির থেকে আলাদা তো বটেই, এবং শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যে কিছু কিছু মূর্তি এমন অদ্ভুত আর ভয়ংকর যে হঠাৎ করে দেখে ফেললে বেশ ভয় লাগে। এ নিয়ে একদিন মাকে প্রশ্ন করতে গিয়ে প্রচণ্ড বকা খাই। মা শাসিয়ে রাখেন, এই কথা যদি ঘুণাক্ষরেও বাইরে যায়, তাহলে ফল ভালো হবে না। এখানে বলে রাখি, আমাদের বাড়ির ঠাকুরঘরে মা আর দিদি ছাড়া অন্য কারও ঢোকা নিষেধ ছিল।

তৃতীয় খটকা লাগে, যেদিন থেকে আমার দিদিও মায়ের সঙ্গে অমাবস্যার দিন উধাও হয়ে যাওয়া শুরু করল।

আপনারা জানেন নিশ্চয়ই, দিদি আমার থেকে বছর পাঁচেকের বড়। দিদি যেদিন প্রথম মায়ের সঙ্গে যায়, তখন আমার বয়েস ছয়। তার আগের রাতে বাড়িতে একটা অদ্ভুত রিচুয়ালের আয়োজন করা হয়। পুজো নয় কিন্তু, রিচুয়াল। বাবা সেদিন বাড়ি ছিলেন না।

আমি ছোট বলে আমার থাকার পারমিশন ছিল।

ঘটনাটা ঘটেছিল মধ্যরাতে। মা ভেবেছিল আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। কিন্তু আমি ঘুমোইনি, লুকিয়ে লুকিয়ে দরজার ফুটো দিয়ে দেখেছিলাম সেই অদ্ভুত অনুষ্ঠান। সেদিন বেশ কিছু অচেনা মহিলা আমাদের বাড়িতে এসেছিল। তাদের আর কোনোদিন দেখিনি। তারা দিদিকে মধ্যিখানে রেখে গোল করে ঘিরে বসেছিল। সারা ঘরে মোমবাতি ছাড়া আর কিছু জ্বলছিল না। সেই ভূতুড়ে আলোয় তারা অজানা সুরে, অজানা ভাষায় দুলে দুলে কী একটা গাইছিল। সেদিন আমার খুব ভয় করেছিল, ভীষণ ভয়।

এখন আমি জানি, ওটা ছিল দিদির প্রথম মেন্সট্রুয়েশনের দিন।

আমার মনে প্রশ্ন উঠতে শুরু করল, কোথায় যায় দিদি? মা কোথায় নিয়ে যায় ওকে? আমাকে বলে না কেন? এমন কোন জায়গায় যায় ওরা যেটা আমাকে বলা মানা?

বড় হওয়ার ওঠার সাথে সাথে দিদির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব বলুন, ঘনিষ্ঠতা বলুন, ভালোবাসা বলুন, সব বাড়তে থাকে। মায়ের আচরণ দিন দিন অদ্ভুত হয়ে আসছিল, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল বাড়ির ওই অদ্ভুত মূর্তিগুলোর পুজো। মা মাঝে মাঝে উন্মাদ হয়ে যেতেন। তখন বাবাও সামলাতে পারতেন না। উন্মাদ হয়ে বিড়বিড় করতেন, 'হেই রে বুড়িমা, আবার তুই ফিরে আসবি রে মাই, তোর দেওরি তোকে ফিরিয়ে আনবে রে বুড়িমাই...'

আস্তে আস্তে মা-বাবার মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। এই পরিস্থিতি সামলাতে সামলাতে বাবার হার্টের রোগ ধরা পড়ে। ডাক্তার বলে যান বাবার ওপর যাতে বেশি স্ট্রেন না পড়ে, তাই মায়ের এই অবস্থায় বাবাকে মায়ের থেকে একটু দূরে রাখাই শ্রেয়। সেই থেকে মা আর বাবা আলাদা ঘরে শুতে শুরু করেন। এদিকে আমাদের বাড়িতে তিনটেই শোয়ার ঘর। আগে বাবা-মা এক ঘরে, দিদি অন্য ঘরে শুত। আমি দোতলার ঘরে একা শুতাম। বাবা আর মা আলাদা শোয়া শুরু করাতে বাধ্য হয়েই দিদিকে আমার ঘরে শুতে আসতে হয়।

তখন দিদির বয়েস সতেরো, আমার বারো। আর এখান থেকেই সব সর্বনাশের শুরু।

দুজনেরই তখন কাঁচা বয়েস। শরীর নিয়ে দুজনেরই অনেক কৌতূহল, অনেক জিজ্ঞাসা।

ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল ঠাট্টা-ইয়ার্কির ছলে। আস্তে আস্তে গায়ে এখানে-ওখানে হাত দেওয়া, খুনসুটি করা, এইসব। আস্তে আস্তে শারীরিক ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। আমরা জানতাম যা করছি তা ঠিক নয়। কিন্তু এই নিষিদ্ধ শরীরী খেলা আমাদের নেশার মতো পেয়ে বসেছিল। রোজ রাতের খাওয়া শেষ হলেই আমরা বিছানায় যাওয়ার জন্য উশখুশ করতাম।

বাবার সঙ্গে মায়ের খিটিমিটি ক্রমেই বাড়তে থাকে। মায়ের উন্মাদদশা ক্রমে বেড়েই চলেছিল। মাঝে মাঝেই মা অজানা ভাষায় বিলাপ করতেন, কাঁদতেন। কাদের যেন অভিসম্পাত দিতেন। ছাদে উঠে বিড়বিড় করতে করতে কী সব আউড়ে যেতেন।

এই করতে করতেই অঘটনটা ঘটে গেল একদিন।

রাতের খাওয়ার টেবিলে মা সেদিন খুব বেশি পাগলামো করছিলেন। আমরা কেউ সামলাতে পারছিলাম না। বাবা শেষমেশ অতিষ্ঠ হয়ে সারাজীবন যা করেননি তাই করলেন, মাকে সজোরে একটা থাপ্পড় মারলেন।

সেই মুহূর্তটা আমার সারাজীবন মনে থাকবে। সেকেন্ডের মধ্যে মায়ের মুখটা রাগে টকটকে লাল হয়ে গেল। ঠোঁটের কোনা দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে। চুলগুলো উড়ছে ডাইনির চুলের মতো। মা রাগে কাঁপতে কাঁপতে

সাপের হিসহিসানির স্বরে বাবাকে বললেন, ‘আমার গায়ে হাত তুললি তুই? বড়দেওরির গায়ে হাত তুললি? এত সাহস হয়েছে তোর? খাব রে শয়তান, খাব। আজই তোকে খাব।’

সেই রাতে প্রচণ্ড ঝড় আসে। মনে হচ্ছিল সারা পৃথিবী উথালপাতাল হয়ে যাবে। দিদি ভয়ে আমার কাছে ঘেঁষে আসে। আমি সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে দিদিকে জড়িয়ে ধরেছি, আমার হাত দিদির বুকে, এমন সময় একটা অদ্ভুত আওয়াজ কানে আসে আমাদের। মনে হল ছাদ থেকে কে যেন একতলায় নেমে যাচ্ছে। ঝড়ের ওই প্রবল মত্ততার মধ্যেও শুনতে পাই, আমাদের দরজার বাইরে মেঝে থেকে আওয়াজ উঠে আসছে, ক্ররর...ক্ররররর...

আমি আর দিদি উঠে দরজাটা অল্প ফাঁক করে উঁকি মারি।

প্রথমে মনে হয় কোথাও কিছু নেই, সবই মনের ভুল। কিন্তু যে ক্ররররর আওয়াজটা সিঁড়ি ভেঙে নীচের দিকে নামছিল, সেটায় কোনো ভুল ছিল না।

এমন সময় বিদ্যুতের আলো ঝলসে ওঠে। জানলার শার্সি থেকে ছিটকে আসা আলোয় দেখি এক ভয়াবহ মূর্তি বাবার ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকছে। লোকটার বলিষ্ঠ শরীর, মাথাটা ন্যাড়া, ঠোঁটটা অদ্ভুতরকমের লম্বা আর বাঁকানো। আর লোকটার সারা গায়ে চামড়া নেই, যেটা আছে সেটা পাখির পালক! কুচকুচে কালো রঙের পালক!

আমি আর দিদি প্রবল ভয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ি। দিদি আমাকে জড়িয়ে ধরে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। আমিও দিদিকে প্রবলভাবে জড়িয়ে ধরি।

সেই রাতেই আমাদের প্রথম যৌন মিলন।

আর পরের দিন সকালে উঠে আবিষ্কার করি বাবা হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন!

এরপর অনুশোচনা, হতাশা সব মিলিয়ে মা পুরোপুরি উন্মাদ হয়ে যান। আমি আর দিদি কী করে সব সামলাব বুঝতে পারছিলাম না। এখানে আমাদের চেনা-পরিচিত আত্মীয়স্বজন বিশেষ নেই, খুব দূর সম্পর্কের এক মামা ছাড়া। তিনিই বেগতিক বুঝে তাড়াতাড়ি দিদির বিয়ে দিয়ে দেন। মায়ের জন্য একজন আয়া রাখা হয়।

কিন্তু তাতে আমার সঙ্গে দিদির শারীরিক সম্পর্কে কোনো ছেদ পড়েনি। মাকে দেখতে আসার অছিলায় দিদি মাঝেমধ্যেই এ বাড়ি আসত। তখন আমরা মিলিত হতাম। দিদির বিয়ে হওয়ার পর মায়ের পাগলামি কিন্তু অনেকটা কমে যায়। মা বোধহয় শেষদিকে বুঝতে পেরেছিলেন আমার আর দিদির ব্যাপারটা। দিদি এ বাড়িতে এলে মুখ ঘুরিয়ে থাকতেন, কথা বলতেন না।

যে বছর আমার মা মারা যান, সেই বছরই দিদিও বিধবা হয়—তারপর আর কী। আমাকে দেখাশোনার অছিলায় দিদি এ বাড়িতে পার্মানেন্টলি এসে থাকতে শুরু করে।

এদিকে আমি হাঁপিয়ে উঠছিলাম, এই অস্বাভাবিক সম্পর্ক থেকে পালিয়ে যাওয়ার রাস্তা খুঁজছিলাম। আমার আর এসব ভালো লাগছিল না। কিন্তু দিদি ছাড়তে চাইত না। এসব বন্ধ করার কথা বললেই হিংস্র হয়ে উঠত। উন্মাদের মতো আচরণ করত। মায়ের কথা ভেবে আমি ভয় পেয়ে যেতাম, কিছু বলতাম না।

তবে শুধু রাগারাগি নয়। দিদি আরও একটা জিনিস করতে শুরু করল।

আগেই বলেছি, দিদিও প্রতি মাসে কয়েকদিন মায়ের মতো হারিয়ে যেত। এবার দিদি সেখান থেকে ফিরে আসার পর চুপিচুপি কিছু একটা ওষুধ খাওয়ানো শুরু করল আমাকে, কোনো ভেষজ ওষুধ। তাতে আমার মাথাটা কেমন যেন ঘেঁটে যেত, স্বাভাবিক বোধ, অনুভূতিগুলো নষ্ট হয়ে যেত। তার বদলে চাগাড় দিয়ে উঠত উদ্দাম, প্রবল যৌন প্রবৃত্তি, আদিম খিদে। আমি ওই দিনগুলোতে বুনো মোষের মতো বল পেতাম শরীরে। বিছানায় ওকে ছিঁড়েখুঁড়ে খেতাম। আর তারপর থেকেই দিদির ওপর নির্ভরশীলতা আরও বেড়ে যেত। মনে হত আমাকে কোনো অদৃশ্য সুতোর টানে নাচাচ্ছে দিদি। প্রায় পাঁচ থেকে ছ’দিনের জন্য আমি কেমন যেন দিদির পুতুল মতো হয়ে থাকতাম।

এইভাবেই চলে যেত, যদি না একদিন মাধুরীর সঙ্গে আমার আলাপ হত।

বাকিটা তো আপনারা বোধহয় এখন জানেন। স্বাভাবিকভাবেই দিদি প্রথমে রাজি হয়নি এই বিয়েতে। তখন বাধ্য হয়েই আমাকে বলতে হয়েছিল যে এই বিয়ে করতে না দিলে আমি সুইসাইড করব। তখন ও নিমরাজি হয়। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি যে ও এই সর্বনাশা খেলায় মাতবে।

আমার ভুল হয়েছে প্রথমেই মাধুরীকে সবটা খুলে না বলা। ভেবেছিলাম বিয়ের পর হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ব্যাপার যে এতদূর এসে পৌঁছোবে, সেটা আমার ধারণার বাইরে ছিল।

কাল যখন পরাগ এসে আপনার কথা বলল, মনে হল আপনিই পারবেন এই সংকট থেকে আমাকে উদ্ধার করতে। বিশ্বাস করুন, এই দুনিয়ায় আমি মাধুরীর থেকে বেশি ভালো আর কাউকে বাসি না। আমি এসব থেকে মুক্তি চাই দাদা, আমি বাঁচতে চাই। যে-কোনো মূল্যে আমি মাধুরীকে ফেরত পেতে চাই।''

জল থেকে মাথা তুললাম। অনির্বাণের ওই শেষ কথাগুলো এখনও আমার কানে বাজছে। একটা অক্ষম ঈর্ষার বিষ যেন বুকের মধ্যে ফণা তুলে দাঁড়াতে চাইছে।

মাথাটা তুলে একবার মেঘে ঢাকা আকাশটা দেখে নিলাম আমি। অমাবস্যার রাত থেকে নেমে আসা কঠিন শৈত্য আমার সমস্ত শরীর অজগরের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরেছে। এক ফলহীন আশাহীন কর্মের ভার পাথরের মতো চেপে বসছিল আমার বুকে। আমি জানি আজ এই অভিযানে আমার জয় হোক বা পরাজয়, মাধুরী আমার হবে না! হয়তো এই গোলকপুষ্পের লতা আমার জীবন গড়ে দেবে, কিন্তু সেই জীবনে মাধুরী থাকবে না।

আজ স্পষ্ট করে বুঝতে পারছিলাম, আমি ওই সর্বনাশীর প্রেমে পড়েছি!

পাড়ে ওঠার পর একটা করে গামছা আর পরিষ্কার ধুতি আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন কাকা, আদেশ করলেন, ''পরে নাও।''

কাপড় পরার পর মনে হল উত্তুরে হাওয়া যেন জমাট বেঁধে আছড়ে পড়ছে আমার বুকে। শিউরে উঠলাম আমি। কাকা বুঝতে পারলেন আমাদের অবস্থাটা। হাতে ছোটমতো কী একটা দিয়ে বললেন, ''চিবিয়ে নাও, আরাম পাবে।''

অন্ধকারে বুঝতে পারছিলাম না কী দিলেন কাকা। মনে হল শেকড়জাতীয় কিছু। মুখে ফেলে চিবোনো শুরু করতেই বুঝলাম একটা ওম ধীরে ধীরে শিরা আর ধমনি বেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেহে।

তিনজনে এগোচ্ছিলাম আমার দেখিয়ে দেওয়া রাস্তা ধরে। সবার হাতে বড় পাঁচ সেলের টর্চ। পরাগের হাতে একটা বড় ব্যাগ। ঝিঁঝির শব্দে ডুবে আছে অন্ধ চরাচর। নাম-না-জানা কোনো জংলি ফুলের মৌতাতে পাগল হয়ে আছে বনভূমি। আকাশ থেকে গুরু গুরু ডাক ভেসে আসছে মাঝে মাঝে। জঙ্গলের পাতা বিছোনো মাটি থেকে একটা জলীয় ভাপ উঠে আসছিল কোমর অবধি।

সবার সামনে আমি। কাকা আমার পেছনেই ছিলেন। শুনলাম বিড়বিড় করে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন তিনি, ''ওঁ নমঃ কালরাত্রি শূলহস্তে মহিষবাহিনি/ রুদ্রকালকৃত শেষয়ে আগচ্ছ আগচ্ছ ভগবতি/অতুলবীর্য্যে সর্বকর্মাণি মে বশং কুরু কুরু...''

চলতে চলতে এবার সেই শুখানালাটা এল। আগের বারে যেখান দিয়ে নেমেছিলাম সেখান দিয়ে না নেমে ফিরে আসার রাস্তাটার দিকে এগোলাম। একটু পরেই পৌঁছোলাম সেই গাছের গুঁড়ি ফেলা সেতুর কাছে।

''ঠাকুরমশাই...'' পরাগের ভয়ার্ত স্বর শুনে পেছনে ফিরলাম। আধা অন্ধকারেও স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে ছেলেটা। আজন্মলালিত সংস্কার পা টেনে ধরেছে ওর।

''চিন্তা কোরো না পরাগ। আমি আশ্বাস দিচ্ছি, তোমার কিচ্ছু হবে না।''

তিনজনে ধীরে ধীরে সেতুটা পার করে ওদিকে পৌঁছোলাম।

আগের বারের মতোই ফেলে আসা বনভূমি আর আমাদের মধ্যে গাঢ় স্তব্ধতা দিয়ে বোনা শীতল ভারী পর্দা নেমে আসছিল ধীরে ধীরে। চারিদিক অবিশ্বাস্য রকমের চুপচাপ। পাতা নড়ার, বাতাসের ফিসফিস, ঝিঁঝির ডাক, রাতচরা পাখিদের কর্কশ স্বর, কিছুই ভেসে আসছিল না। মনে হচ্ছিল প্রকৃতি যেন নিঃশ্বাস নিতেও ভুলে গেছে। সেই গভীর রাত্রির যেন কোনো সাড় নেই, স্পন্দন নেই, প্রাণ নেই। শুধু আছে এক পাষাণবৎ নিষ্ঠুর নীরবতা।

কাকা চাপাস্বরে বললেন, ''বায়ুস্তম্ভ। প্রকৃতিবন্ধন। এ বড় সহজ ঠাঁই নয় ভবতারণ, যা ভেবেছিলাম তার থেকেও অনেক জটিল। আমাদের চেনাজানা তন্ত্রপদ্ধতির থেকে বহু সহস্র গুণ শক্তিশালী কোনো মন্ত্রে এই সমগ্র স্থানটি বন্ধন করে রাখা আছে। অতি প্রাচীন, কয়েক সহস্র বছরের সঞ্চিত এই মন্ত্রজ্ঞান। আমাদের আরও সতর্ক হতে হবে, আরও সাবধান হতে হবে।''

এতক্ষণ ধরে বুকের মধ্যে চেপে রাখা দুরুদুরু ভাবটা এবার দ্রিমিদ্রিমি হয়ে বাজতে লাগল। কারণ আমি জানি এরপর কী হবে, অন্ধকার থেকে উঠে আসবে কাউরীবুড়ির অনুচরেরা, আর উড়ে এসে বসবে সামনের গাছের ডালে।

অথচ আমাকে অবাক করে সেরকম কিছুই ঘটল না!

কথাটা কাকাকে বলতে কাকাও চিন্তিত স্বরে বললেন, ''কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল হচ্ছে ভবতারণ, আমাদের কোনো একটা হিসেব মিলছে না। নইলে এরকম তো হওয়ার কথা নয়।''

একরাশ অনিশ্চয়তা আর ভয় নিয়ে পা বাড়ালাম আমরা।

তিনটে মানুষ হেঁটে যাচ্ছিল সেই নিঝুম নিস্পন্দ জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। টর্চের আলো নিভু নিভু হয়ে আসছিল অজানা কারণে। পেছনের অন্ধকার ক্রমেই আরও ভয়াল, আরও নিশ্ছিদ্র, আরও শ্বাসরোধী হয়ে উঠছিল।

টর্চ ফেলে ফেলে আমরা সুঁড়িপথ ধরে এগোচ্ছিলাম। এইভাবে খানিকটা এগোনোর পর দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। পেছন থেকে কাকা জিজ্ঞেস করলেন, ''কী হল ভবতারণ?''

সামনের দিকে আঙুল তুলে দেখালাম।

আমাদের সামনে সেই ছোট চত্বর, আর তার ওপারেই মূর্তিমান অশনি সংকেতের মতো দাঁড়িয়ে আছে পাথুরে মন্দির। কাউরীবুড়ির মন্দির।

দ্রুতপায়ে মন্দিরে পৌঁছেই কাকা বললেন, ''টর্চ জ্বালো ভবতারণ, মায়ের মুখখানি দেখতে দাও।''

দু'জোড়া টর্চের আলো গিয়ে পড়ল দেওয়ালের উলটোদিকে।

কাকা খানিকক্ষণ তন্ময় হয়ে চেয়ে রইলেন কাউরীবুড়ির মূর্তির দিকে। বিড়বিড় করে বললেন, ''মা যেমন স্নেহ করেন, তেমন শাসনও করেন বই কি! তাই তো মায়ের দুই রূপ, তিনি যেমন ঘোরা, তিনি তেমনই দিব্যাও বটে। তিনি যেমন রুদ্রাণী, তেমন তিনি কল্যাণীও। ভয়ের আড়ালে তিনিই অভয়া, লয়ের মধ্যে তিনিই জয়, মরণের মধ্যে তিনিই অনন্তজীবন। তাঁকে ভয় কী ভবতারণ?''

''ইনি কে ঠাকুর?'' প্রশ্ন করল পরাগ। তার প্রাথমিক কাঁপুনি কমেছে তখন।

''মা যে দেশে দেশে বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়েছেন পরাগ। সে সাগরপারের দেশই হোক, বা ঘরের পাশের ঘর। একদিকে কৃষ্ণবর্ণা মাতৃমূর্তি রূপে অন্যদিকে করালবদনী মৃত্যুদেবী—এই দুই রূপেই দেবী প্রকটিত হয়েছেন বারে বারে। ইনিও মায়ের আরেক রূপ পরাগ। ইনি মহাপরাক্রমশালী নাগজাতির আরাধ্যা দেবী।''

''কিন্তু কাকা, নাগ বলতে তো সাপ...''

''না ভবতারণ। নাগ বলতে সাপের টোটেম বা চিহ্নধারী জাতি বোঝায়। মহাভারতে এঁদের উল্লেখ আছে। অর্জুন নাগরাজ কৌরব্যের কন্যা উলূপীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের ইরাবান নামে এক পুত্র ছিল।''

''কিন্তু কাকা, তার সঙ্গে এই পাতরগোঁয়্যা বা দেওরিদের সম্পর্ক কী?''

''আছে ভবতারণ, গভীর সম্পর্ক আছে। নাগজাতি প্রাচীন ভারতের এক অতি বলশালী নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী। ভেষজবিদ্যা, বিশেষ করে বিষবিজ্ঞানে এঁদের সমকক্ষ আর কেউ ছিলেন না। এঁরা একসময় সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে ছিলেন। তক্ষক নাগের নাম থেকেই তক্ষশীলার নামকরণ। মহারাজ নলের সঙ্গে যে কর্কোটক নাগের সাক্ষাৎ হয় তিনি ছিলেন নিষধদেশীয়, বর্তমানে বিদর্ভের কাছাকাছি। ওদিকে মহাভারতে যে উলূপী অর্জুনের ঘরণী হন তিনি ছিলেন প্রাগজ্যোতিষপুরের।

মহাভারতের বহু আগেই ভারত জুড়ে নাগজাতির প্রব্রজন শুরু হয়। আমার ধারণা এই নাগজাতিরা পরে বর্তমান ব্রহ্মদেশ ও ভারতের সীমান্তবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। আজ থেকে দেড়-দু'হাজার বছর আগে তাদেরই এক অংশ আসামে এসে দেওরি নামে পরিচিত হয়। খুব সম্ভবত তখন যে কটি ভেষজবিদ্যা ও ঔষধিলতা তাঁরা নিয়ে আসতে পেরেছিলেন, এই গোলকপুষ্প তার অন্যতম।

আর নিয়ে আসেন তাঁদের আরাধ্যা এই দেবীকে। ইনি মহাতেজা, মহাঘোরা, মহামোহনাশিনী। ইনি মহাকালের মতো কর্কশ, মৃত্যুর মতো অমঙ্গলজনক, জগতের ভোগতৃষ্ণার সংহারক।''

''কিন্তু কাকা, কে এই দেবী?''

ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন কাকা। টর্চের আলোয় তাঁর চোখ দুখানি জ্বলজ্বল করছিল। গম্ভীর স্বরে বললেন, ''এখনও বোঝোনি ভবতারণ? মাধুরী সামনে এলে শ্মশানধূমের গন্ধ পাও কেন ভবতারণ, ভেবেছ কখনও? মাধুরীর স্বপ্নে এত কাক কেন? কাউরীবুড়ির মন্দিরে যাওয়ার পথে এত কাক কেন? পাতরগোঁয়্যাদের বড়দেওরির প্রথম সন্তান জন্মাবার পর বিধবা হতে হত কেন? এত মৃত্যু কেন? এত বৈধব্য কেন? এত অভিশাপ কেন? এত হাহাকার কেন? এখনও বোঝোনি?''

যে সন্দেহটা আমার মনের কোণে জমে উঠেছিল, সেটা আর আটকে রাখা গেল না, ''ইনি কি...ইনি কি...''

''হ্যাঁ ভবতারণ, ইনিই দেবী ধূমাবতী।''

কাকা চুপ করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের টর্চগুলোও নিভে গেল। চারিদিকে নিরেট পাথুরে অন্ধকার। তার ঊর্ধ্ব বা অধঃ নেই, সীমাও নেই, দিক নেই, মাত্রাও নেই।

''পরাগ'', মন্দিরের মধ্যে গমগম করে উঠল কাকার কণ্ঠস্বর। ''যজ্ঞস্থল প্রস্তুত করো।''

পরাগের সঙ্গে আমরা বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম মন্দিরের দরজার ঠিক সামনে, দেবীমূর্তির দিকে মুখ করে। পরাগ সঙ্গে আনা ব্যাগটা থেকে কতগুলো ছোট ছোট মশাল বার করে একটু দূরে দূরে মাটিতে গুঁজে জ্বালিয়ে দিল। তারপর সেখান থেকে কাকা বেশ কিছু জিনিস বার করে মাটিতে রাখতে শুরু করলেন। সব সাজানো হয়ে গেলে, একটি আধপোড়া কাঠ তুলে নিলেন প্রথমে।

আমি প্রশ্ন করলাম, ''এটা কী কাকা?''

''অর্ধদগ্ধ নিমকাঠ। চণ্ডালের চিতা থেকে তুলে আনা।''

পরাগ কিছুটা বালি ছড়িয়ে দিয়েছিল মাটিতে। কাকা সেখানে ওই আধপোড়া নিমকাঠ দিয়ে প্রথমে একটা বৃত্ত আঁকলেন। তারপর তার পরিধি বরাবর আটটা পাপড়ি। তার বাইরে আরও একটি বৃত্ত আঁকলেন, তার পরিধি বরাবর আঁকলেন ষোলোটি পাপড়ি। তারপর চারিদিকে একটি চতুর্ভুজ ক্ষেত্র এঁকে সেটিকে বদ্ধ করলেন।

''এটা কী আঁকলেন কাকা?''

''ধূমাবতী যন্ত্রম। আজ এই যন্ত্রে আমি দেবী ধূমাবতীকে আহ্বান জানাব, প্রার্থনা করব তাঁর আশীর্বাদ। দেবী ধূমাবতী সাধকের সাধনায় তুষ্ট হলে তার শত্রুক্ষয় করেন, অপশক্তির নাশ করেন। আজ মধ্যরাত্রে এইখানে মাধুরীর দিভাই নিজের ভাইকে নিয়ে যক্ষিণীসাধনে বসবেন। আর একবার যদি সেই যক্ষিণীচক্র সফল হয়, তাহলে জেনে রেখো ভবতারণ, শুধু মাধুরী নয়, তার পরিবার সবংশে নিহত হবে। বংশে বাতি দেওয়ার মতো কেউ থাকবে না।''

“কিন্তু তার প্রতিবিধান কী কাকা?”

“এর একটাই প্রতিবিধান ভবতারণ, বিষস্য বিষৌষধম। এই নাগরমণী যে মহাবিষ মাধুরীর ওপর প্রয়োগ করেছে, তাকে নিষ্ক্রিয় করতে হবে। তাহলেই সেই মহাবিষ প্রত্যাখ্যাত হয়ে আছড়ে পড়বে প্রয়োগকারীর ওপরেই। তবেই মাধুরী বাঁচবে, বাঁচবে তার পরিবার, তার কাছের লোকজন।”

“কী সেই বিষ কাকা? কী উপায়ে সে অসম্ভব সম্ভব হবে?”

“যে বিষ ওই ক্রুরকর্মা মহিলা মাধুরীর সিঁদুরে মিশিয়েছে। গোলকপুষ্প।”

মনে হল রাত্রি যেন আরও গাঢ় হয়ে নেমে এল আমার চারিপাশে। যে মহার্ঘ ঔষধি নিয়ে আমি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছি, মাধুরীর সিঁদুরে মেশানো হয়েছে তারই বিষ? আমাকে ভবিষ্যতের স্বাচ্ছন্দ্য কিনতে হবে মাধুরীর সর্বনাশের বিনিময়ে?

মশালের আলোছায়া খেলে যাচ্ছিল আমার মুখে। কাকা আমার দিকে তাকিয়ে বোধহয় বুঝলেন আমি কী ভাবছি। তারপর বললেন, “ভুল করছ ভবতারণ। মনে মনে যা ভাবছ তা নয়।”

“তাহলে?”

স্নিগ্ধ হেসেই গম্ভীর হয়ে গেলেন কাকা। তারপর বললেন, “এ বড় জটিল খেলা বাবা, বড় সহজ নয়। ওই মহিলা অতি উচ্চস্তরের তান্ত্রিক। পাতরগোঁয়্যাদের বড়দেওরিরা প্রত্যেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তাই-ই ছিলেন, তন্ত্রসিদ্ধা যোগিনী। বৈধব্য তাঁদের অলংকার, গোলকপুষ্প তাঁদের আয়ুধ।

শোনো ভবতারণ, যে ফুলের খোঁজে তুমি এখানে এসেছ তার নাম গোলকপুষ্প কেন ভেবে দেখেছ? শোনো, তার পেছনে একটি কারণ আছে, সে কারণ বড় গুহ্য, বড় গোপন। জেনে রাখো, তন্ত্রশাস্ত্র মতে প্রতিটি রমণীর রজঃ বা ঋতুরক্তের গুরুত্ব অসীম। এই রজঃ স্ত্রীবীজ হিসেবে কল্পিত, তন্ত্রের ভাষায় বলে খ-পুষ্প। এই খ-পুষ্প দেবীর কাছে অতি পবিত্র। সবচেয়ে পবিত্র হচ্ছে অক্ষতযোনি বালিকার প্রথম রজঃ।

এই প্রতিটি রজঃরক্তের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। কুমারীর রজের নাম স্বয়ম্ভূকুসুম, চণ্ডালীর রজের নাম বজ্রপুষ্প, সধবার কুণ্ডোদ্ভব এবং বিধবার রজঃরক্তের নাম গোলোকপুষ্প!”

আমি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। আমার সমস্ত ধারণা ওলটপালট হয়ে যাচ্ছিল। গোলকপুষ্প মানে বিধবার রজঃরক্ত? এই লতা বা ফুলের সঙ্গে মাধুরীর সঙ্গে মাধুরীর ওপর নেমে আসা অভিশাপের কোনো সম্পর্ক নেই? তার মানে ওই মহিলা তাঁর...

“হ্যাঁ ভবতারণ, উনি তাঁর নিজের ক্রিয়ামন্ত্রঃপূত রজঃরক্ত মিশিয়ে দিয়েছিলেন মাধুরীর সিঁদুরে। আর সেই থেকেই এই অনর্থের শুরু।”

ইতিমধ্যে পরাগ ব্যাগ থেকে আরও কিছু জিনিসপত্র বার করে রাখল কাকার সামনে।

কাকা তার মধ্য থেকে কিছু ছোট ছোট কাঠের টুকরো বিশেষ পদ্ধতিতে যন্ত্রের ঠিক মাঝখানে স্তূপাকৃতি করে রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃদুস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ চলতে লাগল,

> “পাতর্যা স্যাৎ কুমারী কুসুমকলিকয়া জাপমালাং জপন্তী,
> মধ্যাহ্নে প্রৌঢ়রূপা বিকসিতবদনা চারুনেত্রানিশায়াম্।
> সন্ধ্যায়াং বৃদ্ধরূপা গলিতকুচযুগা মুণ্ডমালাং বহন্তী
> সা দেবী দেবদেবী ত্রিভুবনজননী কালিকা পাতু যুষ্মান্...”

সমস্ত উপচার শেষ হলে যজ্ঞকাঠে অগ্নিসংযোগ করলেন কাকা। দপ করে জ্বলে উঠল যজ্ঞানল। তাতে একে একে আহুতি দিলেন চন্দনচর্চিত জবাফুল, মুঠিভরা আতপচাল, যজ্ঞডুমুরের কাঠ। সঙ্গে চলতে লাগল উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রপাঠ,

“ভ্রূভঙ্গী ভীমবক্ত্রা জঠরহুতভুজং ভীষণং তর্পয়ন্তি, চণ্ডী স্ফেংকারাকারা টকটকিতহসা নাদসংঘট্টভীমা। লোলা মুণ্ডাগ্রমালাল ললহ লহা-লহা লোল লোলোগ্রবাচং, চামুণ্ডা চণ্ডমুণ্ডং মটমটমটিতং চর্বয়ন্তী পুনাতু...”

যজ্ঞাগ্নি থেকে এবার আগুনের সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসছিল ধোঁয়ার কুণ্ডলী। সেই ধোঁয়া আর মশালের আগুনে কাকার মুখখানি সিল্যুয়েটের মতো দেখাচ্ছিল।

এরপর কাকা আগুনে আহুতি দেওয়ার জন্য হাতে তুলে নিলেন কালোমতো কী একটা। আগুনের কাছাকাছি আনতে সেই আলোয় চিনতে পারলাম জিনিসটা কী। কাকের পালক!

ধোঁয়ার গন্ধ ক্রমেই কটু থেকে কটুতর হয়ে উঠছিল। চোখ জ্বলছিল আমার, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। কাকার অবশ্য তাতে কোনো বিকার ছিল না। মন্ত্রপাঠ করতে করতে ঘি, দুধ আর মধু আহুতি দিলেন যজ্ঞে। তারপর হাতে আরেকটা কিছু তুলে আনলেন। আমি প্রথমে বুঝতে পারলাম না সেটা কী জিনিস। কাকা জিনিসটা যজ্ঞকুণ্ডের কিছুটা কাছাকাছি আনতে আমিও একটু ঝুঁকে এগিয়ে এলাম। কী ওটা? একটুকরো কাপড় নাকি?

হ্যাঁ, তাই তো! কিন্তু সে কাপড়ে শুকনো রক্তের দাগ কেন?

মুহূর্তের মধ্যে চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে গেল। আমি বুঝতে পারলাম ওটা কীসের রক্ত।

ওটা রজঃরক্ত, মাধুরীর মেনস্ট্রুয়েশনের রক্ত।

কাকা আজ সকালে সেটা সংগ্রহ করে এনেছেন ওর থেকে।

হঠাৎ করেই যেন আশপাশের তাপমাত্রা কমে গেল খানিকটা। মাথা তুলে দেখি আকাশের বুকে জমে এসেছে ঘনঘোর মেঘপুঞ্জ। মন্দিরের ঠিক মাথার ওপর লালচে মেঘের দল ঘূর্ণির মতো জমাট বাঁধছে। ওদিকে মন্দিরের চারিপাশের বন আগের মতোই একেবারে স্তব্ধ। রন্ধ্রে রন্ধ্রে বুঝতে পারছিলাম যে মহাপ্রলয় আসন্ন।

কাপড়ের টুকরোটা আহুতি দিতেই আগুনের দলা যেন লাফিয়ে উঠল আমাদের মাথার ওপর, সঙ্গে সঙ্গে একটা সাপের হিসহিসানির শব্দ। ফট করে কিছু একটা ফাটার আওয়াজ ভেসে এল আগুনের ভেতর থেকে। আর তারপরেই একটু আগের কটুগন্ধটা সরে গিয়ে একটা অদ্ভুত গন্ধে ভরে গেল চারিপাশ।

গন্ধটা আমার খুব চেনা। ভিজে কাঠ পোড়ার ভ্যাপসা, শ্বাসরুদ্ধকর একটা গন্ধ।

এইবার কাকা যেটা করলেন সেটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। একটা ছোট্ট জিনিস ব্যাগ থেকে বার করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, ''এই শেষ আহুতি ভবতারণ, আর সেটা তোমার হাত দিয়েই দিতে হবে। চোখ বন্ধ করো, আর আমার সঙ্গে আবৃত্তি করো, 'দিগবাসা কৌতুকেন গ্রসতি জগদিদং যা মহাধূম্রবাসা...'''

হাতের তেলো খুললাম, দেখি মাধুরীর সেই দিদুনের দেওয়া মাদুলি!

''এ কী কাকা? এ তো মাধুরীর দিদুনের দিয়ে যাওয়া...''

''হ্যাঁ ভবতারণ। ওকে আহুতি দাও ওই অগ্নিতে, সমর্পণ করো।''

''কিন্তু কাকা, এ তো মাধুরীর রক্ষার জন্য...''

''ওর প্রয়োজন ফুরিয়েছে ভবতারণ। অপার ভালোবাসা আর অক্ষয় যোগবিভূতি দিয়ে তিনি যে রক্ষাকবচ বানিয়ে দিয়ে গেছিলেন, আজই তার অন্তিম এবং চূড়ান্ত প্রয়োগের দিন। আজকের জন্যই ওকে তৈরি করা হয়েছিল...''

''কিন্তু আমার হাত দিয়ে কেন?''

প্রশ্নটা শুনে থমকালেন কাকা। যজ্ঞের লেলিহান শিখা তাঁর মুখের ওপর আলোছায়ার অজস্র কাটাকুটি খেলছিল। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি বললেন, ''কারণ এই মুহূর্তে একমাত্র ভালোবাসা ছাড়া মাধুরীকে বাঁচাবার জন্য আমাদের হাতে আর কিছুই নেই ভবতারণ। জেনে রেখো, ভালোবাসাই হল সবচেয়ে বড় তন্ত্র, সবচেয়ে বড় জাদু।''

* * * *

আমরা অপেক্ষা করছি মন্দির থেকে একটু দূরে, কয়েকটা গাছের আড়ালে। এখান থেকে মন্দিরের ভেতরের অনেকটা বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। আমি বলতে আমি আর কাকা। পরাগ আছে একটু দূরে, মন্দিরের

কাছাকাছি। কথা আছে যে আমাদের মিশন শেষ হলে আমি আর ও মিলে গোলকপুষ্পের লতাটা সযত্নে তুলে নিয়ে যাব। প্রফিটের বখরা হবে আধাআধি।

যজ্ঞ শেষ হয়েছে কয়েক ঘণ্টা হল। তার ভস্ম ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মন্দিরের সামনের চাতাল জুড়ে। আমরা বসে আছি এই নাটকের শেষ দেখার জন্য, গোলকপুষ্প তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য তো বটেই।

ঘড়ি বলছে এখন মধ্যরাত। রাতের জঙ্গল শুনেছিলাম আশ্চর্য রকমের সুন্দর হয়। কিন্তু এই বনভূমির অতিপ্রাকৃতিক স্তব্ধতা আমাদের বুকের মধ্যে গভীর অস্বস্তির মতো চেপে বসছিল। মনে হচ্ছিল চারপাশের সবকিছু যেন এক অজানা আশঙ্কায় কাঁটা হয়ে আছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি সমস্ত আকাশ লাল। আমাদের ঠিক মাথার ওপর মেঘের ঘূর্ণিমুখ। যে-কোনো মুহূর্তে প্রলয় শুরু হতে পারে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু ঢুলছিলাম বোধহয়। কাকা হঠাৎ করে আমাকে খোঁচা দিতে সজাগ হয়ে উঠলাম। মন্দিরে আসার রাস্তাটার মুখে একটা আলোর ছায়া না?

আস্তে আস্তে আলোটা বেড়ে উঠতে লাগল। কে বা কারা যেন আসছে ওই রাস্তা ধরে। পায়ের চাপে কাঠকুটো ভাঙার অতি ক্ষীণ শব্দ কানে এল। সমস্ত স্নায়ু টানটান সজাগ হয়ে উঠল আমার। ওরা আসছে তাহলে?

কিছুক্ষণের মধ্যেই সুঁড়িপথ বেয়ে অনির্বাণ বেরিয়ে এল জঙ্গল থেকে, হাতে একটা বড় টর্চ। মন্দিরটা চোখে পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। সামান্য দুলছে ওর অবয়ব। ছেলেটা নেশা করেছে নাকি?

ধীরে ধীরে তার পাশে অলঙ্ঘ্য নিয়তির মতো ফুটে উঠল কার যেন অবয়ব। খিলখিল হাসির সঙ্গে ভেসে এল একটা প্রশ্ন, ''কী রে ভাই, থেমে গেলি কেন?''

''এ...এটা কোথায় এলাম দিদি?''

''তুই ছোটবেলায় বারবার জিজ্ঞেস করতি না'', আবার সেই খুনখুনে খিলখিল স্বর, ''আমি মাঝে মাঝে সারাদিনের জন্য কোথায় যাই?''

''এইখানে আসিস তুই? এই জঙ্গলের মধ্যে?'' অনির্বাণের স্বরের মধ্যে স্খলিত ভাব স্পষ্ট। ও কি নেশা করেছে?

''হ্যাঁ রে অনি, আমি এখানেই আসি যে। মাও এখানেই আসত। দিদিমাও। দিদিমার মা। তার মা। আমরা সব্বাই আসতাম এখানে। চুপিচুপি। কাউকে না জানিয়ে।''

''কে...কেন? এ...এখানে আসত কেন?''

''মায়ের পুজো দিতে ভাই। মায়ের আদেশ ছিল যে।''

''কীসের আদেশ? কোন মায়ের পুজো?''

''ওই যে মন্দিরটা দেখছিস ভাই, ওটা কীসের মন্দির জানিস?''

''ন্না...ন্না তো।''

''আমাদের মায়ের মন্দির। সবার মায়ের মন্দির। কাউরীবুড়ির মন্দির।''

''কাউরীবুড়ির মন্দির? কাউরী মানে তো কাক...কাকেদের আবার মন্দির হয় নাকি?''

কথা বলতে বলতে দুটো ছায়া হেঁটে যাচ্ছিল মন্দিরের দিকে। অনির্বাণের পরনে একটা ধুতি আর উড়নি। পাশের খর্বকায় দেহটি চিনতে আমার বিন্দুমাত্র ভুল হয়নি। আজও মহিলার কোমরে একটি বেতের চুবড়ি। সেদিনের কথা মনে পড়তেই আমার সারা শরীরে একটা শিহরন খেলে গেল।

দুজনে যখন চত্বরটার মাঝামাঝি, হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন মহিলা। দেখাদেখি দাঁড়িয়ে পড়ল অনির্বাণও। কিছু জিজ্ঞেস করল দিদিকে। ভদ্রমহিলা জবাব দিলেন না। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কী যেন খুঁজলেন। আকাশের দিকে মুখ তুলে কী একটা শোঁকার চেষ্টা করলেন। তারপর ওইখানে দাঁড়িয়েই

চারিপাশটা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে থাকলেন। যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম, ঠিক সেখানে এসে দৃষ্টিটা থেমে গেল।

বুকটা ধড়াস ধড়াস করছিল আমার। মহিলা বুঝতে পেরে গেলেন নাকি? ঠোঁটের কোণে একটা হাসি ফুটে উঠল না?

নাহ, চারিদিকটা দেখে আবার মন্দিরের দিকে চলতে শুরু করলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে অনির্বাণও। ওর অবিন্যস্ত হাঁটাচলা দেখে বোঝাই যাচ্ছিল ও নিজের বশে নেই। যেন পুতুলের মতো ওকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বধ্যভূমির দিকে।

মন্দিরের মধ্যে দুজন অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আলো জ্বলে উঠল সেখানে। এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম যে দেবীমূর্তির পায়ের সামনে জ্বলে উঠেছে দুটি বিশাল মাটির প্রদীপ। আরও দুটি বড় প্রদীপ জ্বেলে দেওয়া হল মন্দিরের কোনায়। তাদের আলোয় দুটি দীর্ঘ ভূতুড়ে ছায়া খেলে যাচ্ছিল মন্দিরের দেওয়ালে।

এবার পুজো শুরু হল। কিন্তু আজকের পুজো আগের দিনের পুজোর থেকে আলাদা।

মূর্তির সামনে একে অন্যের দিকে মুখ করে বসল দুজন। প্রথমে মহিলা চুবড়ি থেকে একটা মাটির ভাঁড় তুলে নিলেন, একটা কাচের বোতল থেকে তাতে ঢেলে দিলেন কিছু তরল। তারপর সেটা খাইয়ে দিলেন অনির্বাণকে। অনির্বাণ পুরো ভাঁড়টা এক নিমেষে খালি করে পাশে ছুড়ে দিল। চোখ বুজে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর দেখলাম ওর মাথাটা ঝুঁকে পড়ল বুকের কাছে।

মহিলা এবার কিছু ফুল ইত্যাদি তুলে নিয়ে একবার মূর্তির পায়ে ছোঁয়ালেন, তারপর ছুড়ে দিলেন অনির্বাণের বুকের দিকে। তারপর তুলে নিলেন আরও কিছু, দেবীর পায়ে ছুঁইয়ে রাখলেন অনির্বাণের মাথায়। সঙ্গে ক্রমাগত চলছিল মন্ত্রোচ্চারণ।

এইরকম চলল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর মহিলা উঠে মন্দিরের বাইরে এলেন। এদিক-ওদিক দেখে বাঁদিকে একটু এগিয়ে কী একটা তুলে নিলেন মাটি থেকে। অন্ধকারে মনে হল কী যেন একটা ছটফট করছে মহিলার হাতে।

কাকা আমার হাতে আলতো চাপ দিলেন, ‘‘তৈরি হও ভবতারণ। যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই ঘটতে চলেছে।’’

‘‘কী আশঙ্কা কাকা?’’

‘‘একটু আগেও দেখেছিলে ওখানে কিছু রাখা আছে বলে?’’

‘‘কই, না তো!’’

‘‘তাহলে ওটা ওখানে এল কী করে?’’

জবাব দেওয়ার আগে আমার চোখ চলে গেল মন্দিরের ভেতরে। হাতের ভেতরে ছটফট করতে থাকা প্রাণীটাকে দেবীর পায়ের কাছে রাখা হাড়িকাঠে চড়িয়েছেন মহিলা। আর তারপর আগের দিনের মতোই একটা ধারালো ছুরি দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে কী একটা মন্ত্র পড়তে পড়তে তার মাথাটা কেটে ফেললেন।

আগের দিনই দেখেছি এই জিনিস ঘটতে, আমার আঁতকে ওঠার কথা নয়, তবুও উঠলাম। কারণ এইবার যে প্রাণীটাকে উনি বলি দিলেন সেটা একটা কাক!

কাকা অস্পষ্ট স্বরে বললেন, ‘‘কাকভোগ!’’

বলির রক্তটা গড়িয়ে যাচ্ছিল গোলকপুষ্পের দিকে। মহিলা সেই রক্ত তুলে নিয়ে তিলকের মতো টেনে দিলেন অনির্বাণের কপালে। তারপর অনির্বাণের গায়ের উড়নিটা একটানে খুলে ফেললেন।

কাকা অস্ফুটে বললেন, ‘‘যক্ষিণীচক্র শুরু হতে চলেছে ভবতারণ, চূড়ান্ত সময় আগতপ্রায়। সতর্ক হও, চোখকান খোলা রাখো। যাই ঘটুক না কেন, আমি যখন যেটা করতে বলব তখন সেটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। আমার আদেশের যেন অন্যথা না হয়।’’

ততক্ষণে অনির্বাণকে উপুড় করে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে দেবীমূর্তির পায়ের কাছে। তার দুই হাত সামনে, হাড়িকাঠটিকে বেষ্টন করে প্রসারিত। এখান থেকেই বুঝতে পারছি সম্পূর্ণ নগ্ন সে। মহিলা ঝুঁকে পড়েছেন ওর ওপর, পিঠে কী যেন একটা এঁকে দিচ্ছেন রক্ত দিয়ে। দুই কাঁধের ওপর রাখলেন কিছু রক্তবর্ণ পুষ্পগুচ্ছ।

তারপর মহিলা উঠে দাঁড়ালেন। খুলে ফেললেন নিজের পরনের কাপড়। আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। যক্ষিণীচক্রের শুরু।

মহিলা অনির্বাণের পিঠের ওপর পদ্মাসনে বসলেন, মুখখানি দেবীর মূর্তির দিকে। এখান থেকে তাঁর অনাবৃত পিঠ, মুখের ডানদিকটা আর অবনত স্তনের খানিকটা অংশ দেখতে পাচ্ছিলাম। প্রদীপের আলোয় চকচক করছে অনির্বাণের নিস্পন্দ দেহ। ছেলেটা জড়বস্তুর মতো শুয়ে আছে মাটিতে। মনে হচ্ছে ও যেন আর বেঁচে নেই, ওখানে যেটা পড়ে আছে সেটা ওর মৃতদেহ।

এতদূর থেকেও মন্দিরের ভেতরের ঘটনাগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। প্রদীপের আলো-আঁধারিতে সেই উলঙ্গিনী নারীমূর্তির ছায়া দেখে আমার চোখে যেন ধাঁধা লেগে গেল। মহিলার হাত-পাগুলো দেহের তুলনায় এত লম্বা হয়ে গেল কী করে? একটু আগে খোঁপা করে বাঁধা চুলগুলো ডাইনির মতো উড়ছে কেন? স্তন দুখানি এত শুষ্ক কেন?

জঙ্গলের মধ্যে এক প্রাচীন মন্দির, তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত অদ্ভুতদর্শন দেবী, আর তার সামনে দুই নগ্ন মানুষ-মানুষীর আদিম উপাসনা, সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল আমার সামনে যেন একটা প্রাগৈতিহাসিক ছায়াছবি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই বুঝি ঘটে যাবে একটা অঘটন, আকাশ থেকে নেমে আসবে অশরীরী কোনো...

একঝলক ঠান্ডা বাতাস আমার মুখে ঝাপটা মেরে যেতে আকাশের দিকে চাইলাম আমি। মাথার ওপর জমে আসা মেঘের দল এখন আরও গভীর, আরও ঘন। যে-কোনো মুহূর্তে ঝড় শুরু হবে।

মহিলা প্রথমে দু'হাত তুলে প্রণাম করলেন কাউরীবুড়ির মূর্তিকে। তারপর সম্পূর্ণ অজানা কোনো ভাষায়, অতি উচ্চকণ্ঠে শুরু করলেন মন্ত্রোচ্চারণ।

কাকা ফিসফিস করে বললেন, ''শুনতে পাচ্ছ ভবতারণ?''

''পাচ্ছি কাকা। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু ভাষাটা বুঝতে পারছি না।''

''এ ভাষা আমাদের চেনা পৃথিবীর কোনো ভাষাই নয় ভবতারণ। পরাগের বুড়ো ঠাকুর্দা কী বলেছিল গোলকপুষ্পর ব্যাপারে? পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর পাতাল থেকে তুলে আনা অভিশাপ। পাতাল ভবতারণ, পাতাল। যে পাতালে এই নাগজাতির বাস। এ তাদেরই ভাষা, হাজার হাজার বছর ধরে এই ভাষায় তারা পুজো করে এসেছে তাদের আরাধ দেবীকে।''

''কিন্তু...কিন্তু...এত দূর থেকে এত স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি কী করে কাকা?''

''বায়ুস্তম্ভন ভবতারণ, এই প্রাচীন বিদ্যায়...''

কাকার কথা শেষ হল না, কারণ ততক্ষণে একটা অশরীরী দৃশ্য স্তম্ভিত করে দিয়েছে আমাদের দুজনকে।

অনির্বাণের দু'হাত পেঁচিয়ে ধরেছে কোনো এক গুল্মলতা। শুধু পেঁচিয়ে ধরেছে তাই নয়, মুহূর্তে মুহূর্তে বেড়ে চলেছে তার দৈর্ঘ্য। মনে হচ্ছে যেন মাটির গভীর থেকে উঠে এসেছে কোন অতিদীর্ঘ মহাসর্প, ক্রমশ তা গ্রাস করে চলেছে অনির্বাণের শরীরের ঊর্ধ্বভাগ। সে দৃশ্য এতই অবিশ্বাস্য, এতই হাড়হিম করে দেওয়া যে আমার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা শীতল বিদ্যুতের ঝলক নেমে গেল যেন।

কাকা অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন, ''গোলকপুষ্প।''

আমি দু'চোখে ঘোর অবিশ্বাস নিয়ে দেখছিলাম যে লতা তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার এত পরিশ্রম, এত পরিকল্পনা, সেই মায়াবী লতা এখন হাড়িকাঠের সামনের গহ্বর থেকে উঠে এসেছে ভয়াল নিয়তির মতো। ক্ষণে ক্ষণে বেড়ে চলেছে তার দৈর্ঘ্য। মোটা কাছির মতো আষ্টেপৃষ্ঠে সে বেঁধে ফেলছে অনির্বাণের শরীর।

দু'হাত তুলে উন্মাদের মতো হেসে উঠলেন সেই নারী। জয়, জয় হয়েছে তাঁর। তাঁর আহ্বান শুনে ঘোর পাতাল থেকে উঠে আসছে সেই শয়তানি লতা। আজ তিনি সিদ্ধকাম। আজ তিনি জয়ী।

অনির্বাণের পিঠ থেকে উঠে দ্রুতপায়ে মন্দিরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন সেই উলঙ্গিনী যক্ষিণী। তারপর মন্দিরের সামনের চত্বরটি বৃত্তাকারে ঘুরতে শুরু করলেন তিনি, দু'হাত উপরে তুলে উচ্চৈঃস্বরে আউড়ে যেতে লাগলেন কোনো এক সুরেলা মন্ত্রগান। মানুষের স্মৃতির অনধিগম্য কোন এক অশরীরী গানের সুর ঘুরে বেড়াচ্ছিল সেই আদিম বনভূমি জুড়ে। তার ক্ষয় নেই, তার লয় নেই, তার আদি নেই, তার অন্ত নেই। সেই ভৌতিক অপেরা-সংগীত কান্নার সুরে মাতাল করে তুলছিল অন্ধকার রাত, আর সেই নিঃসাড় বনাঞ্চল।

কাকা আমার হাত চেপে ধরলেন, ''গাছের দিকে তাকাও ভবতারণ।''

দেখি মন্দিরের পিছনে গাছের ডালে উড়ে এসে বসেছে কাকেদের দল। তাদের দৃষ্টি এখন পাতরগোঁয়্যাদের বড়দেওরির দিকে, যিনি বাতাসে মিশিয়ে দিচ্ছিলেন দুর্বোধ্য ভাষার আহ্বান। সেই আহ্বান ক্রমেই আরও উচ্চকিত হয়ে উঠছিল। হয়ে উঠছিল আরও তীব্র, আরও তীক্ষ্ণ।

হঠাৎ করে দেখি তারা নেই, অকস্মাৎ উধাও হয়ে গেছে কোথাও! কাকার দিকে মুখ ফিরিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই তিনি আঙুলটা ঠোঁটের ওপর চেপে ধরলেন। ইশারা করলেন সামনের দিকে দেখতে।

যেমন হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেছিল কাকেদের দল, ঠিক তেমনই হঠাৎ করে মন্দিরের পেছনের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল একদল নারী। তাদের আহ্বানকারীর মতো তারাও নগ্ন, উলঙ্গ। সেই ঘোর কৃষ্ণবর্ণা রমণীর দল ঘিরে দাঁড়াল তাদের কর্ত্রীকে। তারপর মাটিতে বসে তারাও দু'হাত উপরে তুলে গাইতে লাগল সেই অলৌকিক প্রার্থনাসংগীত।

এই দৃশ্য দেখে আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এসেছিল। কোনোমতে জিজ্ঞেস করলাম, ''এরা কারা কাকা?''

''এরা তারাই ভবতারণ, যারা দেবীর আদেশে এক রাত্রের মধ্যে ধ্বংস করেছিল পাতরগোঁয়্যাদের। এরা তারাই, যাদের তুমি প্রথম দিন দেখেছিলে এখানে আসার সময়। ওরা কাউরীবুড়ির অনুচর ভবতারণ, পাতাল থেকে উঠে আসা অন্ধকারের প্রহরী। আড়াইশো বছর ধরে ওরা পাহারা দিয়ে এসেছে তাদের আরাধ্যা দেবীর মন্দির। অপেক্ষা করে আছে কবে কোনো এক বড়দেওরি এসে মুক্তি দেবেন ওদের।''

আমার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা হিমেল স্রোত বয়ে গেল, ''কিন্তু এরা এখন এখানে কেন কাকা? কেন ডেকে আনা হয়েছে ওদের?''

''ভয় পেও না ভবতারণ। যদি আমার কিছুমাত্র যোগবিভূতি থাকে, যদি নিষ্ঠাভরে দেবীর পূজার্চনা করে থাকি, তবে শুনে রাখো, আজ এই সাধনার ফল অতি ভয়ংকর হবে। যে মহান বিদ্যা হাজার বছর ধরে গুপ্ত ছিল, গুহ্য ছিল, প্রকটিত হত শুধুমাত্র সমষ্টির স্বার্থে, আজ তাকে প্রয়োগ করা হয়েছে অতি হীন উদ্দেশ্যে। ওই যক্ষিণী নারী কেবলমাত্র নিজের স্বার্থ পূর্ণ করার জন্য, নিজের অতৃপ্ত কামবাসনার আগুনে আহুতি দেওয়ার জন্য আয়োজন করেছে দেবী ধূমাবতীর গোপনতম চক্রসাধনার। এর ফল অতি ভয়াবহ ভবতারণ। জেনে রাখো, আজ এই উন্মুক্ত প্রান্তরে, আড়াইশো বছর পর আবার দেবীর ক্রোধ নেমে আসবে। আর এবার নেমে আসবে অন্য কারও ওপর নয়, নেমে আসবে পাতরগোঁয়্যাদের শেষ বড়দেওরির ওপরে।''

কাকার শেষের কথাগুলো আমার কানে ঢুকছিল না। কারণ ভ্রূকুটি-থমথম আকাশের নীচে, নির্জন বনভূমির মধ্যে এক উন্মুক্ত প্রান্তরে একদল নগ্ন ছায়ারমণীর নাচ ক্রমেই আরও উদ্দাম, আরও অপার্থিব হয়ে উঠছিল।

চোখটা একবার বন্ধ করে আবার খুললাম। হা ঈশ্বর, এসব কী দেখছি আমি?

কাকার দিকে চাইতে দেখি চোখ বন্ধ করে কী যেন উচ্চারণ করছেন তিনি। কোনো মন্ত্র কি? হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু...কিন্তু ভাষাটা সংস্কৃত নয়।

এমনকি আমার চেনাজানা কোনো ভাষাই নয়!

এ সেই ভাষা, যাতে একটু আগে মন্ত্রোচ্চারণ করছিলেন ওই নাগযক্ষিণী।

আমার সবকিছু গুলিয়ে গেল। ইনি কী করে জানলেন এই ভাষা? এই মন্ত্র? আসলে কে ইনি?

আমার ভাবার মধ্যেই হঠাৎ এক আর্ত চিৎকারে খানখান হয়ে গেল চারিদিক। তাকিয়ে দেখি সমস্ত চত্বর জুড়ে দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছে আগুন। মুহূর্তের মধ্যে লেলিহান হয়ে উঠেছে তার শিখা। তার থেকে বেরিয়ে আসার পথ নেই। সেই আগুনের রং লাল, টকটকে লাল, ঠিক যেমন আমাদের যজ্ঞের আগুনটি ছিল। আর ভিজে কাঠ পোড়ার একটা খুব চেনা ভ্যাপসা, শ্বাসরুদ্ধকর গন্ধ তীব্র হয়ে বেড়ে উঠে আমার চৈতন্য আচ্ছন্ন করে দিল।

সামনে ছড়িয়ে থাকা ভূখণ্ডখানি জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছিল আর্তনাদ, আতঙ্কের লেলিহান শিখা। আমাদের যজ্ঞের ছাই যেখানে যেখানে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই প্রতিটি ভস্মকণা থেকে উত্থিত হয়ে উঠেছিলেন মহাহুতাশনসর্প। সেই মহাপাবক লেলিহান শিখায় পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল ওরা। তাদের আর্তনাদ আমাকে বধির করে দিচ্ছিল। আমি ছটফট করে উঠছিলাম। আজ এতগুলো মানুষের মৃত্যু দেখতে হবে আমাকে?

ভাবতে ভাবতেই কতগুলো ক্র্যাঁড়ও ক্র্যাঁও স্বরে আর্ত চিৎকার ভেসে এল আমার কানে। সে অমানুষিক আওয়াজ কীসের? কীসের আওয়াজ ওগুলো? এত পালক পোড়ার গন্ধই বা আসছে কোথা থেকে?

আস্তে আস্তে আমার চোখের সামনে মূর্ত হয়ে উঠল একদল মানুষ প্রমাণ আকারের পাখির দল। আগুনের মাথা ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে উঠেছে তাদের কালো মাথা, তাদের বাঁকানো ক্ষুরধার চঞ্চু। আর জ্বলন্ত হলুদ চোখের মধ্যিখানে উন্মত্তের মতো ঘুরছে লাল টকটকে মণিগুলি। আজ বুঝতে পারলাম কোন মহাভয়ংকর নারকী পাখির দল সেদিন নেমে এসেছিল পাতরগোঁয়্যাদের গ্রামে!

কিন্তু আজ তাদের চোখে জিঘাংসার বদলে অন্য কিছু ছিল। ভয়। মহাভয়। মৃত্যুভয়।

হঠাৎ করে থেমে গেল কাকার অদ্ভুত মন্ত্রোচ্চারণ, তারপর উত্তেজিতভাবে নির্দেশ করলেন মন্দিরের ভেতরের দিকে।

এতক্ষণে মন্দিরের ভেতরে চোখ গেল আমার, আর হৃৎপিণ্ডটা প্রায় কণ্ঠার কাছে এসে আটকে গেল।

গোলকপুষ্পের লতা তখন প্রায় ঢেকে ফেলেছে অনির্বাণের শরীর। মনে হচ্ছিল যেন একটা সবুজ মমি পড়ে আছে মন্দিরের মেঝেতে। তখনও তার ওপর দিয়ে সাপের মতো বেড়ে চলেছিল সেই শয়তানের লতা। তার ওপর ঝুঁকে পড়েছেন অনির্বাণের দিদি, জান্তব স্বরে আর্তনাদ করতে করতে পাগলের মতো ঝাঁকাচ্ছেন অনির্বাণের দেহ। দু'হাতে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছেন সেই দৃঢ়বদ্ধ লতাজাল। কিন্তু হায়, ব্যর্থ সাধনার অভিশাপ তখন আর ফেরাবার উপায় নেই।

মন্দিরের ভেতরের দিকে ক্ষেপণাস্ত্রের মতো ধেয়ে গেল একদলা অগ্নিপিণ্ড।

ঠিক তখনই মাথার ওপর শোনা গেল শনশন শব্দ। মাথা উঁচু করে দেখলাম বিশাল কিছু একটার ছায়া আকাশের বুক ছেয়ে নেমে আসছে আমাদের দিকে।

''পালাও ভবতারণ, পালাও। ও আসছে তোমারই জন্যে। যেভাবে হোক পালাও এখান থেকে, নিজের প্রাণ বাঁচাও।''

প্রবল ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞেস করলাম, ''ওটা কী কাকা? কী নেমে আসছে আকাশ থেকে?''

''কী নয়, বলো কে।''

আমার মুখ থেকে কথা বেরোল না। তার আগেই বলে উঠলেন কাকা, ''পালাও ভবতারণ, এখনই পালাও, যেদিকে দু'চোখ যায়। আজ ও তোমাকে আর আমাকে এখানে টেনে এনেছে খুন করবে বলেই, সেটাই ওর আসল উদ্দেশ্য। ও এই ডাইনির দোসর, সমস্ত পাপের ভাগীদার। সেইজন্যই ও অত সহজে অনির্বাণকে আমাদের জন্য নিয়ে আসতে পেরেছিল। সেইজন্যই ও যখন আজ এখানে ঢোকে, কাউরীবুড়ির অনুচরেরা ওর ক্ষতি করেনি। ওই-ই আজ কাকভোগ তুলে দিয়েছিল ওই রাক্ষসীর হাতে...''

''কিন্তু কাকা...আপনি কী করে এত নিশ্চিত হচ্ছেন?''

এই প্রথম উত্তেজিত হতে দেখলাম কাকাকে, তিনি চিৎকার করে বললেন, ‘‘মনে করে দ্যাখো ভবতারণ, মন্দিরে ঢুকে যখন আমি যখন বললাম, ‘টর্চ জ্বালো ভবতারণ, মায়ের মুখখানি দেখতে দাও’, তখন কিন্তু তোমার সঙ্গে সঙ্গে ওর টর্চের আলোও আছড়ে পড়েছিল মাতৃমূর্তির ওপরে। ও কী করে জানল দেবীমূর্তি মন্দিরের ঠিক কোথায়, যদি না ও এখানে আগে থেকেই এসে থাকে? যেদিন ও মংকুর মুখে শুনেছে তোমার এখানে আসার কথা, সেদিন থেকে ও তোমার পেছনে ঘুরছে মৃত্যু হয়ে, কাউরীবুড়ির ছায়া হয়ে। তোমাকে ও কাউরীবুড়ির কাছে বলি দিতে চায় ভবতারণ, পালাও। আমার কথা ভেবো না, এক্ষুনি পালাও এখান থেকে। যেদিকে দু’চোখ যায়...’’

ততক্ষণে মানুষপ্রমাণ বিহঙ্গমটির ছায়া সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত হয়ে নেমে আসছে আমার মাথার ওপর। তার হিংস্র নখের সারি বেরিয়ে এসেছে উদগ্র আয়ুধের মতো। তার দিকে তাকিয়ে মোহগ্রস্তের মতো বললাম, ‘‘এ কি...এ কি...তাহলে...’’

‘‘হ্যাঁ ভবতারণ, মগলহানজামা মারা যায়নি। চাংদেওমাই তাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয় সঙ্গীকে এই অদ্ভুত ক্ষমতা দিয়ে যান। আড়াইশো বছর ধরে মগলহানজামার মৃত্যুহীন আত্মা রক্ষা করে এসেছে তাঁর উত্তরাধিকারীদের, আদেশ পালন করে এসেছে পাতরগোঁয়্যাদের বড়দেওরিদের। এই-ই হত্যা করেছে অনির্বাণের বাবাকে, এই-ই ধর্মনাশ করতে উদ্যত হয়েছিল মাধুরীর। মগলহানজামা-ই আসলে পরাগ বসুমাতারি...’’

আমি আর শুনিনি। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড় দিলাম জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। শুধু তার আগে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম, যেখানে দাঁড়িয়ে কাকা কথা বলছিলেন, সে জায়গাটা ফাঁকা! সেখানে কেউ নেই!

* * * *

আমি প্রাণভয়ে দৌড়োতে থাকলাম জঙ্গলের আরও ভেতরে। গাছের ডাল সপাং সপাং করে আছড়ে পড়ছে আমার চোখেমুখে, পা আটকে যাচ্ছে লতায়, ঘাসে। কোনোমতে সেগুলো ছাড়িয়ে জঙ্গলের আরও গভীরে ঢুকে যেতে চাইছি আমি। আমি জানি, এখন এই জঙ্গলই আমার রক্ষাকর্তা। মাঝে মাঝে ওপরে তাকিয়ে দেখছি, গাছের মাথার ফাঁকে দেখা যাচ্ছে সেই বিশাল কালো ছায়া। মৃত্যুর ছায়া উড়ে আসছে আমার পালাবার পথ অনুসরণ করে। বিন্দুমাত্র ফাঁকা জায়গা পেলেই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে সে।

ছুটতে ছুটতে একটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়ালাম কিছুক্ষণ। বুকটা হাপরের মতো ওঠানামা করছিল। চোখ বন্ধ করে নিঃশ্বাস নিলাম। সারা গা বেয়ে দরদর করে নামছে ঘামের স্রোত। হাত-পা কাঁপছে থরথর করে, ভয়ে, আতঙ্কে।

চোখটা খুলে চারিদিক দেখে নিলাম একবার। আর তখনই একটা ব্যাপার লক্ষ করলাম।

ঝিঁঝিঁপোকার ডাক। আমি ঝিঁঝিঁপোকার ডাক শুনতে পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছি রাতচরা পাখিদের ক্ষীণ আওয়াজ।

তাহলে কি আমি নিজের অজান্তেই পেরিয়ে এসেছি ওই অভিশপ্ত মন্দিরের চৌহদ্দি?

মাথার ওপরে তাকালাম, গাছের ফাঁক দিয়ে যতটা দৃষ্টি যায়। পুবের আকাশ খুব অল্প লাল।

ডানদিকে তাকিয়ে দেখি জঙ্গল পাতলা হয়ে এসেছে অনেকটাই। ডালপালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে জঙ্গলের গা ঘেঁষে এক বিশাল জলাশয়। মাগুরির বিল।

কী করব আমি? জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকব দিনের আলো ফোটা অবধি? ওর হাত থেকে বাঁচার জন্য এ ছাড়া আর উপায় আছে?

ফের একবার আকাশের দিকে তাকালাম। কোথায় ও?

মাথার ওপরে কেউ নেই। কিচ্ছু নেই।

দুটো হাত হাঁটুতে ভর দিয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম একবার। ঠিক তখনই শব্দটা কানে এল। মৃদু। সন্তর্পণ। কাছে। খুব কাছে।

আস্তে আস্তে ঘাড়টা বাঁদিকে ঘোরালাম। ও দাঁড়িয়ে আছে। আমার থেকে খানিকটা দূরে।

কে ও? কী নাম ওর?

নাহ, এখন আর ওর কোনো নাম নেই।

দৈর্ঘ্যে আমার থেকে এক হাত উঁচু। কুচকুচে কালো গায়ের রং। অন্ধকারের মধ্যেও বুঝতে পারছিলাম সারা শরীরে ঢেউ খেলছে পেশি। কাঁধের পাশে দুটো ডানার আভাস, যদিও সে দুটো মিলিয়ে আসছিল দ্রুত। নাক আর মুখ মিলিয়ে যেটা আছে সেটা চঞ্চু বা ঠোঁট ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। আর চোখ, উফ, সেই ভয়ানক চোখ। স্থির অচঞ্চল চোখে সেই দানব তাকিয়ে ছিল আমার দিকে।

কী ছিল সেই দৃষ্টিতে? রাগ? ক্ষোভ? প্রতিশোধের বাসনা?

ডানদিকে ঘুরেই দৌড় দিলাম আমি। আমাকে পৌঁছোতে হবে ওই বিলে। যে করে হোক, যে-কোনো মূল্যে হোক।

ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োচ্ছিলাম আমি। পেছন থেকে ভেসে আসছিল কাঠপাতা ভাঙার মড়মড় শব্দ। এত কাছে এসে শিকারকে হাতছাড়া হতে দেবে না সে। প্রতি মুহূর্তে তার সঙ্গে আমার ব্যবধান কমে আসছিল। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল এই বুঝি আমার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সাক্ষাৎ মৃত্যু! ও আসছে, ও আসছে...

দুটো শরীর একসঙ্গেই ঝাঁপ দিল বিলের জলে।

প্রথমে বেশ খানিকটা তলিয়ে যাওয়ার পর জলের নীচে স্থির হলাম। এই অন্ধকারে কয়েক হাত জলের নীচে কিছুই দেখার সম্ভাবনা নেই। স্থির হয়ে বোঝার চেষ্টা করছিলাম কোথায় গেল ও!

হঠাৎ কে যেন বড় বড় নখ দিয়ে খামচে ধরল আমার পা দুটো, আর টেনে নিয়ে যেতে চাইল জলের নীচে। দ্রুত, খুব দ্রুত জলের মধ্যে ডুবে যেতে থাকলাম আমি। ছটফট করতে থাকলাম উঠে আসার জন্য, প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকলাম...

কিন্তু না! সব চেষ্টা ক্রমে ব্যর্থ হতে থাকল। আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। প্রবল বেগে ছটফট করছি, একটু একটু করে আমার চোখের সামনেটা অন্ধকার হয়ে আসছে। আর বোধহয় শেষরক্ষা হল না। চোখের সামনে গাঢ় অন্ধকারের পর্দা নেমে এসেছে, শিথিল হয়ে এসেছে শরীরের পেশিগুলো, আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি, এমন সময় আমার মনে হল ডুবে যেতে যেতে হঠাৎ করে থমকে দাঁড়ালাম।

বহু কষ্টে মাথাটা একটু তুললাম। দেখলাম যে মাথার ওপরের জলটা যেন আলো হয়ে আছে। আর সেখান থেকে দুটো হাত নেমে এল জলের মধ্যে। পুরুষ নয়, নারীর হাত। দুটি নিরাভরণ কৃশকায় হাত আমার কাঁধদুটো আঁকড়ে ধরল সজোরে, আর টেনে নিয়ে যেতে লাগল জলের ওপরে।

শুরু হল প্রাণপণ লড়াই। ধারালো নখের আঁচড় কেটে বসছে আমার পায়ের মাংসে। ওপরের টানও ক্রমশ বেড়ে উঠেছে। একসময় বুঝতে পারলাম নীচের দিকের টান আলগা হয়ে আসছে ক্রমশ। যত ওপরে উঠছি, তত আমার হাতে সাড় ফিরে আসছে। বেঁচে যেতে পারি, এই বোধটুকু আমার মাথার মধ্যে গেঁথে যেতেই আমার শরীরে আর মনে দুনো বল এল। আমি সাঁতার কেটে উঠছি, উঠছি...আরও ওপরে উঠছি...জলের ওপর আলোটা এখন অনেক স্পষ্ট। শরীর আর মনের সবটুকু জোর একত্র করে সেদিকে সাঁতার কাটতে লাগলাম আমি। মনে হচ্ছে ওই জলের মধ্যেই আমার শরীর ঘিরে যেন আলোর বন্যা বইছে—সেই আলোয় জলের অতলে বহুদূর অবধি দেখা যাচ্ছে। প্রাণপণে ওপরে উঠতে উঠতেই নীচের দিকে তাকিয়ে একটা অপার্থিব অলৌকিক দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

দেখি যে মহামৃত্যুবিহঙ্গ আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল অতল জলের গভীরে, তার সারা শরীর গ্রাস করেছে একঝাঁক জলজ লতা। সেই দ্রুত বেড়ে ওঠা লতার ঝাঁক হাত-পা বেঁধে ফেলছিল তার, আর প্রধান লতাটি কালসর্পের মতো নির্ভুল লক্ষ্যে পেঁচিয়ে ধরছিল ওর গলা।

ছটফট করতে করতে তলিয়ে যাচ্ছিল ও, আড়াইশো বছর ধরে বেঁচে থাকা এক প্রেত। তার শ্বাস বন্ধ করে দিচ্ছিল আমার খুব পরিচিত একটি গুল্ম। আর আর সেই গুল্মের মাথাটা ছোবল দিতে ওঠা সাপের ফণার মতো!

এতদিনে বুঝলাম ওসমানের এনে দেওয়া পুথিটার সেই অদ্ভুত শ্লোকের অর্থ, গোলকপুষ্পাৎ মহাভয়ং সঞ্জাতং যদ্ভবিষ্যতে। তদ্ভয়ং নিবারণার্থং গোলকপুষ্পং বিধীয়তে। গোলকপুষ্প থেকে যদি মহাভয় উৎপন্ন হয়, তাহলে গোলকপুষ্পই তোমাকে রক্ষা করবে!

কোনোমতে হাঁপাতে হাঁপাতে ডাঙায় উঠে কাদার মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। শরীরে আর একবিন্দু শক্তি অবশিষ্ট ছিল না।

খানিকক্ষণ পর মাথা তুলে দেখি পুবের আকাশ খানিকটা লাল। তবুও অন্ধকার কাটেনি পুরোটা। চোখের পাতায় জলকাদা লেগে সামনেটা ঝাপসা দেখাচ্ছিল। সেই আলো-অন্ধকারের মধ্যে দেখলাম আমার থেকে কিছু দূরে এক বৃদ্ধা রমণী ধীরে ধীরে হেঁটে মিলিয়ে যাচ্ছেন জঙ্গলের মধ্যে। সামান্য ন্যুব্জ হয়ে হাঁটছেন তিনি। পরনে বিধবার বেশ। বাতাসে উড়ছে তাঁর শ্বেতশুভ্র কেশরাজি। চলে যেতে যেতে একবার থামলেন তিনি, তারপর ঘাড় ঘোরালেন আমার দিকে।

আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।''

* * * *

চাটুজ্জেমশাইয়ের গল্প শেষ। সবাই স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। রাত হয়েছে অনেক। বাইরের বৃষ্টিটাও ধরেছে খানিকটা।

প্রথম প্রশ্ন করল গদাই, ''আপনার কাকার আর কোনো খবর পাননি পরে?''

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন চাটুজ্জেমশাই, ''না হে। কোনো খবর নেই। শিলিগুড়িতে যে পাড়ায় থাকেন বলে জানিয়েছিলেন, সেখানে গেছিলাম খোঁজ করব বলে। পাড়ার লোক তো শুনে আকাশ থেকে পড়ল। বলে ওই নামের বা ওই চেহারার লোক কস্মিনকালেও ও পাড়ায় দেখেনি কেউ।''

''কাজের জায়গায় খোঁজ নেননি?''

''নিয়েছিলাম। সেটাও ভুয়ো। শুধু একবার কথায় কথায় বলেছিলেন ওঁদের আদি বাড়ি নাকি নবদ্বীপে। সেখানে গিয়ে অবশ্য আর খোঁজ নেওয়া হয়নি। ও হ্যাঁ, বাজারে ওঁর লেখা একটা বইও নাকি আছে, তন্ত্রমন্ত্রের ওপরে। তার নামটাও ছাই খেয়াল নেই আর।''

কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এল বিশু, ''কাকার নামটা কী বললেন যেন?''

''বলেছি হে, গল্পের মধ্যেই বলেছি একবার। তোমরা বোধহয় খেয়াল করোনি। উনি নিজের নাম বলতেন কে. এন. ভট্টাচার্য। কৌলিক উপাধি অবশ্য মৈত্র। পুরো নাম কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য মৈত্র। একবার ঠাট্টা করতে করতে বলেছিলেন, আগমমতে তন্ত্রসাধনা করেন বলে লোকে নাকি ওঁকে উপাধিও দিয়েছে একটা, আগমবাগীশ।''

বিশু শুনে ভুরু কুঁচকে রইল।

রঘুর খটকা কিন্তু তখনও যায়নি। প্রশ্ন করল সে, ''আচ্ছা চাটুজ্জেমশাই, একটা কথার জবাব দিন তো। আপনার কাকার নাহয় তন্ত্রের বিশেষ ক্ষমতা ছিল বলে বিনা বাধায় ওই মন্দিরের ওখানে যেতে পেরেছিলেন। পরাগ ওরফে মগলহানজামার কথা ছেড়েই দিলাম। কিন্তু যেখানে আড়াইশো বছরে কেউ যেতে পারেনি, বা গেলেও বেঁচে ফিরে আসতে পারেনি, সেখানে আপনি প্রথমবার ঢুকে পড়লেন কী করে? তাও সম্পূর্ণ বিনা বাধায়?''

চাটুজ্জেমশাই কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে রইলেন। তারপর বরাভয় দেওয়ার ভঙ্গিতে ডান হাতের চেটোটা তুলে ধরলেন সবার চোখের সামনে।

সবাই ঘিরে ধরল চাটুজ্জেমশাইকে, কিন্তু বুঝল না কিছুই। একমাত্র বিশুই শুধু ওর ডানহাতের তর্জনীটা চাটুজ্জেমশাইয়ের হাতের তেলোর ওপর রেখে অস্ফুটে বলতে লাগল, ‘‘বৃহস্পতির স্থান উচ্চ, একটি রিং চিহ্নও দেখা যাচ্ছে বর্তমান সেখানে...সেইসঙ্গে শনির স্থানও অতি উচ্চ, উমমমখ সেখানে একটা ত্রিশূলের চিহ্ন—তার ওপর...কেতু থেকে বৃহস্পতি অবধি একটি রেখা প্রসারিত...’’

চাটুজ্জেমশাইয়ের নিজের বলা কথাটাই মনে পড়ে গেল সবার, এ অতি উঁচু দরের আধ্যাত্মিক হাত, লাখে একটা মেলে!

উঠে পড়ছিলেন চাটুজ্জেমশাই। এরপর ওঁকে গিয়ে রান্না চাপাতে হবে। বেরোবার আগে হঠাৎ করে প্রশ্ন করল বংশী, ‘‘আচ্ছা, মাধুরীর শেষমেশ কী হল সেটা বললেন না তো চাটুজ্জেমশাই?’’

বেরিয়ে যেতে যেতে থমকে গেলেন ভদ্রলোক, তারপর পিছনে না ফিরেই বললেন, ‘‘এরপর আবার বিয়ে করে সে। তারপর দীর্ঘ তিরিশ বছর সুখে-দুঃখে কাটিয়ে শ্রীমতী মাধুরী চট্টোপাধ্যায় মারা গেছেন, বছর দুয়েক হল।’’

চাটুজ্জেমশাই বেরিয়ে গেলেন। বাকিরা স্তব্ধ!

সমাপ্ত